পূর্ব ভারত

(মানুষ ও সংস্কৃতি)

PURVA BHARAT

(Manus O Sanskriti)

ISSN 2319-8591

বর্ষ : ৫ সংখ্যা : ৪ , ডিসেম্বর ২০২২

প্রকাশক

ইস্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্য স্টাডিজ অব সোশ্যাল সায়েন্সেস

গভ. রেজিঃ নং – **S/1L/79269(2011)**

শোভাগঞ্জ, পো: আলিপুরদুয়ার, জেলা: আলিপুরদুয়ার

যোগাযোগের ঠিকানা

ডঃ সুলেখা পন্ডিত, পূর্বাচল, ২য় বাই লেন, কোর্ট কমপ্লেক্স, ওয়ার্ড নং ১,

পো: আলিপুরদুয়ার কোর্ট, জেলা: আলিপুরদুয়ার, পিন- ৭৩৬১২২

ইমেল- eastindiansocietyapd@gmail.com

দূরভাষ:- 9434630784 (সভাপতি), 7407018862 (সম্পাদক),

9434494655 (সহ সম্পাদক), 9733134588 (কর্মসমিতি সদস্য)

পূর্ব ভারত
(মানুষ ও সংস্কৃতি)
PURVA BHARAT
(Manush O Sanskriti)
ISSN 2319-8591

প্রকাশক:
ইস্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্য স্টাডিজ অব সোশ্যাল সায়েন্সেস
গভ. রেজিঃ নং – **S/1L/79269 (2011)**
শোভাগঞ্জ, পো: আলিপুরদুয়ার, জেলা: আলিপুরদুয়ার

প্রকাশ কাল: ডিসেম্বর, ২০২২
©ইস্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্য স্টাডিজ অব সোশ্যাল সায়েন্সেস

প্রচ্ছদ: স্বাধীন ঝা

মূদ্রণ:
অক্ষর প্রকাশনী
বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬
সংগ্রহ মূল্য
ব্যক্তিগত (বার্ষিক) **৫০০ টাকা** (ভারতীয় টাকা)
প্রতিষ্ঠান (বার্ষিক) **৮০০ টাকা** (ভারতীয় টাকা)

প্রাপ্তিস্থানঃ ডঃ সুলেখা পন্ডিত, পূর্বাচল, ২য় বাই লেন, কোর্ট কমপ্লেক্স, ওয়ার্ড নং ১, পোঃ আলিপুরদুয়ার কোর্ট, জেলা- আলিপুরদুয়ার, পিন- ৭৩৬১২২
দূরভাষ: 9434630784 (সভাপতি), 7407018862 (সম্পাদক), 9434494655 (সহ: সম্পাদক), 9733134588 (কর্মসমিতি সদস্য)

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই গবেষণা পত্রিকার কোন প্রবন্ধ কিংবা প্রবন্ধের কোন অংশের কোনরূপ পুনঃপ্রকাশ বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বিঃদ্রঃ এই পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধে তথ্যের ব্যাখ্যা ও মতামত সম্পূর্ণতই লেখেকের নিজস্ব। এর দায়িত্ব কোন ভাবেই পত্রিকার ও সম্পাদক মণ্ডলীর নয়।

Copyright 2023 © All Rights Reserved by East Indian Society for the Studies of Social Sciences.

The "East Indian Society for the Studies of Social Sciences" was established a few years ago; but its official journey was flagged off on the 5th of April, 2011, when it was registered under the societies Registration Act (West Bengal XXVI, 1961) with the Reg. No. S/1L/79269 (2011-2012) of the Government of West Bengal. It is a Non-Government and nonprofit organization pledged to carry on the mission of research in social sciences with India in general and Eastern-India in particular as the main theme in its objective of interdisciplinary explorations. As a part of multi-faceted social activities of the society, two biannual peer reviewed Journals namely "East Indian Journal of Social Sciences" (in English language) & "Purva Bharat" (Manus O Sanskriti) in Bengali Language with ISSN are being published regularly. Seminars and debates on significant topics are held as many times as financially possible in a year.

ইস্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্য স্টাডিজ অব সোশ্যাল সায়েন্সেস

কার্যনির্বাহী সমিতি

সভাপতি

ডঃ সুলেখা পন্ডিত

সহ-সভাপতি

পুষ্পজিৎ সরকার

সম্পাদক

সুজয় দেবনাথ

সহকারী সম্পাদক

জয়দীপ সিং

কোষাধ্যক্ষ

অনুপ রঞ্জন দে, জিতেন শীল

মুখ্য সম্পাদক

ডঃ সুলেখা পন্ডিত
অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার

সহযোগী সম্পাদক

ডঃ শ্রাবণী ঘোষ
অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, আলিপুরদুয়ার

ডঃ অখিল সরকার
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ, নবদ্বীপ, নদীয়া

স্বাধীন ঝা
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, দেওয়ানহাট মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার

পরীক্ষক মণ্ডলী

প্রফেসর (ডঃ) দীপক কুমার রায়

ডিন কলা অনুষদ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

পূর্বতন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর (ডঃ) মাধবচন্দ্র অধিকারী

পূর্বতন ডিন কলা অনুষদ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর (ডঃ) কার্তিক চন্দ্র সুত্রধর

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

সম্পাদকীয়

আবার প্রকাশিত হল গবেষণামূলক পত্রিকা 'পূর্ব ভারত'। এই সংখ্যায় নির্ধারিত বিষয় ছিল 'পূর্ব ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন'। কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রবন্ধের অভাবে বিষয় নির্বিকল্পতা সম্ভব হয় নি। ছাপতে হয়েছে অন্য বিষয়ে প্রেরিত লেখাগুলি থেকে নির্বাচিত কয়েকটিকেও।

'পূর্ব ভারত' বিষয় কেন্দ্রিক লেখা প্রাপ্তির সমস্যা চলছে প্রায় বার বছর আগে প্রথম পত্রিকাটি প্রকাশের শুরু থেকেই। পূর্বদিকে সূর্যোদয় হলেও পূর্ব ভারত দীপ্তি লাভে বঞ্চিত। আলোর ঝলসানি কখনও ঘটেনি। অন্তরালের কারণ গবেষণার দুষ্প্রাপ্যতা। পূর্ব ভারত প্রকৃতি, সম্পদ, মানুষ, সমাজ, অর্থনীতি, কৃষি–শিল্প–বাণিজ্য, রাজনীতি, শিক্ষা, দর্শন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি কেন্দ্রিক বিষয়গুলিকে মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে ধরে নিলেও বৃহত্তর ভারতের বিষয় গুলিকেও স্থান, কাল ও প্রভাবের গুরুত্বে মূদ্রণের জন্য নির্বাচিত করা হয়। সময়ে এমন প্রবন্ধ হস্তগত হয় যা পত্রিকার নির্ধারিত বিষয়ের কেন্দ্রমুখী নয়। সে সকল প্রবন্ধকে অসহায় ভাবে বাতিল না করে উপায়ন্তর থাকে না। প্রবন্ধ প্রদানকারী সকলকে সে কারণে অনুরোধ করব তাঁরা যেন 'পূর্ব ভারত' পত্রিকাটির নির্ধারিত বিষয়ের পরিধিতে প্রবন্ধ প্রেরণ করেন।

কালের নিরিখে অতীত, বর্তমান এমনকি ভবিষ্যতের পূর্বাভাস কেন্দ্রিক বিষয়ও গবেষণা নির্ভর যুক্তিগ্রাহ্য লেখা ভাবনার জগতে বা পাঠকের মন আবর্তন সৃষ্টি করতে পারে; কিন্তু জনপ্রিয় বিষয়ও নতুনত্বের অভাবে দৈন্যদশাপ্রাপ্ত লেখা প্রতি গ্রাহ্য ও চির-আদরনীয়। গবেষণা সাধারণত শূন্যস্থান ভরাট করে; তাই জ্ঞানের জগতে শূন্যস্থান পূরণকারী লেখার মর্যাদা স্বতন্ত্র। প্রবন্ধ প্রদানকারী গবেষকগণ এই বিষয়টিকে ধ্যান রাখবেন আশা করি।

এ যাত্রায় পত্রিকাটি প্রকাশে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যগণ বিপুল পরিশ্রম করেছেন। পূর্ণ সহযোগিতায় সকল বিষয় উদ্বেগ প্রশমিত করেছেন সোসাইটির সম্পাদক স্বয়ং। আন্তরিক ধন্যবাদ এঁদের সকলের প্রাপ্য।

সুলেখা পণ্ডিত

ডিসেম্বর, ২০২২
আলিপুরদুয়ার

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

১. স্বাধীনতা আন্দোলনে মানভূম জেলায় নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্তের ভূমিকা
ডঃ অলকা মাহাতো ০৮

২. বিরসা মুন্ডার ধর্মীয় চেতনা ও মুন্ডা বিদ্রোহে এর প্রভাব
ডঃ রত্না পাল ১৭

৩. স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ব ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্যবাদী আদর্শের প্রবেশ (১৮৭১–১৯৩৪ খ্রীঃ)
কৌশিক চক্রবর্তী ২৬

৪. ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাঙালি নারী
তনুজা খাতুন ৩৮

৫. বিধানচন্দ্র রায় ও তাঁর সময় ২৪পরগনার বসতি স্থাপনের ধারাঃ একটি পর্যালোচনা
ডঃ বিপুল মণ্ডল ৪৬

৬. উত্তর-পূর্ব ভারতে মূলধারার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী বৈষ্ণবধর্মের বিবর্তন
অসীম বিশ্বাস ৫৫

৭. চব্বিশ পরগণা জেলার মিশ্র লৌকিক ধর্ম সাধনাঃ একটি পর্যবেক্ষণ
মোফাজুর রহমান মোল্লা ৬২

৮. মহেশখালির আদিনাথ মন্দির : ইতিহাস ও ঐতিহ্য
মুহাম্মদ ইসহাক ৭২

৯. ভারত–বাংলাদেশ ছিটমহল : উৎস থেকে দেশভাগ
সুবিনয় দাস ৭৯

১০. স্বাধীনোত্তর মালদা জেলার মুসলিম নারীর শিক্ষাগত অবস্থানঃ একটি সমীক্ষা (১৯৪৭-২০১১)
ইয়াসমিন রেজা ৯৫

১১. গ্রন্থ পর্যালোচনা
সুদীপ ভট্টাচার্য ১০৮

স্বাধীনতা আন্দোলনে মানভূম জেলায় নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্তের ভূমিকা

ডঃ অলকা মাহাতো
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
ইতিহাস বিভাগ, আড়ষা কলেজ

সারসংক্ষেপ :

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ আসমূদ্র হিমাচল সর্বত্র আছড়ে পড়েছিল। জাতীয় স্তরের মতো আঞ্চলিক স্তরেও বহু মানুষ দলে দলে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৭০ এর দশক থেকে মাইক্রো হিস্ট্রির চর্চা বৃদ্ধি পায়। ফলে আঞ্চলিক স্তরের বহু অজানা ইতিহাস গবেষণার মাধ্যমে উঠে এসেছে যা বৃহত্তর ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। তাসত্ত্বেও এখনও আঞ্চলিক স্তরে পূর্ণাঙ্গ গবেষণার অবকাশ রয়েছে। তৎকালীন বিহার প্রদেশের মানভূম জেলা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে আপোষহীন লড়াই করে গেছে যার সাক্ষ্য ইতিহাসের পাতা ওল্টালেই বোঝা যায়। জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানভূমের আপামর জনসাধারণ দেশ মুক্তির জন্য নিঃস্বার্থভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই জেলার জনগণকে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন যেসব নেতৃবৃন্দ তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত। তিনি কেবলমাত্র স্বাধীনতা সংগ্রামীই ছিলেন না, ছিলেন একজন ছাত্র দরদী শিক্ষাবিদ। আলোচ্য প্রবন্ধে মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের ভূমিকা উপর আলোকপাত করার প্রচেষ্টা থাকবে।

শব্দ সূচক : আন্দোলন, মানভূম, স্বাধীনতা, নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত, মুক্তি, আঞ্চলিক প্রভৃতি।

ভূমিকা

বিগত কয়েক দশক থেকে 'Micro history' র চর্চার প্রতি গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় আঞ্চলিক ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে উঠে আসতে সক্ষম হয়েছে যা জাতীয় ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। তৎকালীন সুবে বাংলা তথা ভারতের অন্যতম বৃহত্তম জেলা ছিল মানভূম। গঙ্গা নারায়ণ হাঙ্গামার ফলস্বরূপ ১৮৩৩ সালে এই জেলার উৎপত্তি ঘটেছিল।[১] এই জেলার সহজ সরল স্বাধীনচেতা জনগণের উপর ব্রিটিশ সরকারের কোপ বারে বারে পড়েছে। ১৯০৫ সালে ঘোষিত লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গ বিভাজনের শিকার হয়ে ১৯১১ সালে এই জেলা তৎকালীন বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ফলে এখানকার জনগণের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্বভাবতই ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন সংঘটিত হলে সেই আন্দোলনে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মানভূমের জনগণকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে সামিল করতে এবং নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত। তিনি ছিলেন একাধারে একজন সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও এই জেলার এক অনন্য স্বাধীনতা সংগ্রামী।

গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

আঞ্চলিক ইতিহাসকে বাদ দিয়ে জাতীয় ইতিহাস কখনোই পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হতে পারে না। বিশেষ করে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন সংঘটিত করার ক্ষেত্রে জাতীয় স্তর থেকে আঞ্চলিক স্তর সর্বত্র নেতৃবৃন্দের সক্রিয় সহযোগিতা একান্তই কাম্য ছিল এবং তার দৃষ্টান্তও রয়েছে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের আপামর জনসাধারণ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দলে দলে যোগদান করেন তার প্রামাণ্য দলিল আঞ্চলিক গবেষণামূলক ইতিহাসগ্রন্থ সমূহ। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে গ্রাম-শহরের জনসাধারণকে জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত করা খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। যে সব নেতৃবৃন্দ একাজে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের সংগ্রামী চেতনার ইতিহাস গবেষণার একান্ত প্রয়োজন। আলোচ্য গবেষণা পত্রটির মাধ্যমে পূর্ব ভারতের একটি অন্যতম বৃহত্তম জেলা মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃৎ নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্তের সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

মূল আলোচনা

মানভূম জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের পথিকৃৎ নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার গাউপাড়া গ্রামে ১৮৭৬ সালে এপ্রিল মাসে জন্ম গ্রহণ করেন।[২] ছোট বেলা থেকেই তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি স্কুল জীবন শুরু করেন গ্রামের পাঠশালা থেকে তারপর বরিশালের ব্রজমোহন ইনস্টিটিউট এ ভর্তি হন এবং ১৮৯৩ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯০০ সালে তিনি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করেন।[৩] ছাত্র জীবনে তিনি বাংলার অন্যতম রাজনৈতিক নেতা অশ্বিনী কুমার দত্তের সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁর কাছ থেকেই তিনি দেশ ও জাতির সেবার মন্ত্রণা পেয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মানবসেবার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি জাতির কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেন। মহান সাধক শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সাধন শিষ্য দরবেশজী মহারাজ ছিলেন তাঁর পরম বন্ধু।[৪] স্বাভাবিকভাবে তাঁর জীবনে এইসব সাধকদের বিশাল প্রভাব ছিল। সংসার জীবনের প্রতি আগ্রহ না থাকলেও পরিবার ও আত্মীয়ের চাপে তাকে সংসারী হতে হয়েছিল। ১৯০০ সালে তিনি বাংলাদেশের যোগেশ চন্দ্র সেনের মেয়ে লাবণ্যময়ীকে বিবাহ করেন। ছাত্র জীবন শেষ করে তিনি মেদিনীপুর জেলায় স্কুল পরিদর্শক হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন।

১৯১১ সালে নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত মানভূম জেলায় বদলি হয়ে আসেন।[৫] মানবাজার ও ঝালদায় কয়েক বছর দক্ষতার সাথে স্কুল পরিদর্শক হিসেবে কাজ করার পর ১৯১৪ সালে মানভূম জেলা স্কুলে শিক্ষকতার চাকরিতে যোগ দেন। কর্মদক্ষতার জেরে মাত্র দু বছরের মধ্যে ১৯১৬ সালে তিনি ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে আসীন হন।[৬] শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ প্রশাসক কর্তৃক তিনি অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। সহজ সরল জীবন অথচ বাগ্মী ও পাণ্ডিত্য তাঁকে ছাত্রদের কাছে আকৃষ্ট করে তুলেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ছাত্রদের প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কর্তব্যের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি ভক্তিভাব, ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতাবোধ, ঋষিকল্প ভাবমূর্তি, ভাগবত

গীতার উচ্চ ভাবাদর্শ, উপনিষদের উপর অগাধ পাণ্ডিত্য শীঘ্রই তাকে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করেছিল। বহু ছাত্র তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল।

পেশায় একজন আদর্শ শিক্ষক হলেও নিজেকে শুধুমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন নি। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁকে বিচলিত করেছিল। তিনি অশ্বিনী কুমার দত্তের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বদেশের জন্য বিভিন্ন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি মানভূমে শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার জনগণকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার শিক্ষা প্রদান করতেন। গান্ধীজি কর্তৃক দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের সফল আন্দোলন সারা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত গান্ধীজীর এই সত্যাগ্রহের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং সত্যাগ্রহের আদর্শ মানভূমের জনগণের কাছে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করেছিলেন। তিনি শীঘ্রই গান্ধীজীর একজন একনিষ্ঠ ভক্ত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং গান্ধীবাদী আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানভূমে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

গান্ধীজি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম সর্বভারতীয় অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলে সারা ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণ তাতে সাড়া দিয়েছিল। এই আন্দোলন জাতীয় স্তর থেকে আঞ্চলিক স্তর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তৎকালীন বিহার প্রদেশের মানভূম জেলাও এর থেকে বাদ পড়ে নি। এই জেলায় অসহযোগ আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন নিবারন চন্দ্র দাশগুপ্ত। তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়ে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের আদর্শ এবং খাদির প্রচার করেন। এই সময় শিক্ষকতার চেয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে অধিক ব্যস্ত রাখতেন। বিহার ও উড়িষ্যা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে জনমত গঠনে সচেষ্ট হন। বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রত্যেকটি অধিবেশনে তিনি উপস্থিত থাকতেন। সুভাষচন্দ্র বসু, চিত্তরঞ্জন দাশের মতো জাতীয় ও প্রাদেশিক স্তরের বহু নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সরকারের অধীনে উচ্চ পদের চাকরি ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার নজির গড়ে তুলেছিলেন। মানভূম জেলাতেও এদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে রাজনীতিতে যোগদান করেছিলেন। এমনকি ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে তিনি পেনশন নিতেও অস্বীকার করেছিলেন। ফলে এই সময় তিনি তাঁর পরিবারকে নিয়ে এক অনিশ্চিত জীবন যাপন শুরু করেন। জেলার এক সহৃদয় ব্যক্তি উপেন্দ্র মোহন দাশগুপ্ত এই সময় তাঁকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বাড়িতেই নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত পরিবার সহ কিছুদিনের জন্য আশ্রয় নেন। তাঁর কাছে শিক্ষকতার চাকরির চেয়ে দেশের স্বাধীনতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁর এই নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ মানভূমবাসীকে কে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অপর এক স্বাধীনতা সংগ্রামী অতুল চন্দ্র ঘোষ ওকালতি ছেড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এইভাবে নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের নেতৃত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানভূমের মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে বেশ কয়েকজন স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করতে শুরু করেন। উপেন্দ্র মোহন দাশগুপ্ত, জীমূতবাহন সেন প্রমূখরা মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২০ সালের ৩১ শে জুলাই সার্চলাইট পত্রিকার অফিসে আহুত এক সাংগঠনিক বৈঠকে নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্তের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।[৭] ১৯২১ সালে তিনি তিলক জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।[৮] ১৯২১ সালে নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ সহ কয়েক জনের সহযোগিতায় মানভূমে স্বদেশী শিল্পের

কারখানা হিসেবে পুরুলিয়ার নীলকুঠি ডাঙ্গায় শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।[৯] পরবর্তীকালে এটি রাজনীতির প্রধান কর্মকেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং ১৯২৮ সালে তেলকল পাড়ায় স্থানান্তরিত হয়। নিবারণচন্দ্র সপরিবারে সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন এবং সেখান থেকেই মানভূমের যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপ চলতে থাকে।

অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গান্ধীজি বিভিন্ন প্রদেশে প্রচার কার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৯২০ সালে তিনি বিহার প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় ব্রিটিশ বিরোধী জনমত গঠন, খাদির প্রচার, চরকায় সুতাকাটা, বিদেশি দ্রব্য বর্জন, প্রভৃতি প্রচার করতে থাকেন। তিনি রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে বিহারের প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করে জ্বালাময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে বিহারের জনগণকে জাতীয় আন্দোলনে সামিল হওয়ার যজ্ঞে আহ্বান জানান। বিহারের জনগণ তাঁর বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন জায়গায় পিকেটিং, বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশীর প্রচারকার্যে নিজেদের নিয়োগ করেন। মানভূমে নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, অতুলচন্দ্র ঘোষ, উপেন্দ্র মোহন দাশগুপ্ত প্রমুখের উদ্যোগে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির উপর জোরদার প্রচেষ্টা চালানো হয়। কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে ব্রিটিশ বিরোধী জনমত গঠনে নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের উদ্যোগে মানভূমের বিভিন্ন স্থানে মিটিং, মিছিল ও সভার আয়োজন চলতে থাকে। জনগণ তাঁর বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে দলে দলে যোগ দিতে থাকেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও খিলাফত কমিটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আরা সম্মেলনে তিনি মানভূম জেলার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।[১০] এই সম্মেলন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে একধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বলে স্থানীয় পত্রিকাগুলি ঘোষণা করেছিল। চোরিচৌরার ঘটনায় অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে মানভূমেও আন্দোলন স্থিমিত হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক নেতারা দিশেহারা হয়ে পড়েন। জাতীয় স্তর থেকে আঞ্চলিক স্তর সর্বক্ষেত্রে সমালোচনার ঝড় বয়েছিল। মানভূম তথা বাংলায় এই সময় স্বাধীনতা আন্দোলন জিইয়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস ও তাঁর স্বরাজ্য দল। মানভূমের পুরুলিয়ায় চিত্তরঞ্জন দাশের নিজস্ব বসতবাটি (বর্তমানে নিস্তারিণী কলেজ) পরিণত হয়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনৈতিক কর্মকেন্দ্রে। বহু রাজনৈতিক নেতা এখানে মিলিত হয়ে মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত সহ মানভূমের নেতৃবৃন্দ চিত্তরঞ্জন দাশের সাথে একযোগে কাজ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুতে মানভূম তথা বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন অপুরনীয় ক্ষতির শিকার হয়েছিল। মানভূমের রাজনীতিতে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত। গড়ে তোলেন মানভূম কংগ্রেস।

১৯২৫ সালের এপ্রিল মাসে গান্ধীজী বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসের ১২তম অধিবেশনে রাজেন্দ্র প্রসাদের সাথে যোগদান করেন। এই অধিবেশন মানভূম জেলার পুরুলিয়ায় তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখানেই গান্ধীজী ও তাঁর অনুরাগী নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্তের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। গান্ধীজী এই সময় এক সপ্তাহ ব্যাপী পুরুলিয়ায় থাকাকালীন মানভূমের বিভিন্ন এলাকায় স্বাধীনতার প্রচার অভিযান করেন এবং এই সময় তাঁর নিত্য সঙ্গী ছিলেন নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত। ফলে গান্ধীজী স্বাধীনতা সংগ্রামের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করেন। নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্তসহ এখানকার বহু অনুগামী তাঁর বক্তব্যে আপ্লুত হয়েছিলেনএবং নিবারণ চন্দ্রের কাছ থেকেও তিনি উপনিষদ ও গীতার

ব্যাখ্যা শুনে মোহিত হয়েছিলেন। এই সময় গান্ধীজী নিবারণচন্দ্রের সহজ সরল জীবন যাপন প্রণালী ও বেদ পুরাণের উপর পান্ডিত্য লক্ষ্য করে তাকে 'ঋষি' অভিধায় ভূষিত করেছিলেন।[১১] স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার করার জন্য ১৯২৫ সালে মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়। নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত এর সভাপতি এবং অতুলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন।[১২] এই জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় জাতীয়তাবাদের মন্ত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কংগ্রেস কর্মীরা তৎপর হয়ে ওঠেন।

গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রত্যেকটা ব্যক্তির কাছে সশরীরে নিজের মতাদর্শ, গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের আদর্শ ও জাতীয়তাবাদের মন্ত্র তুলে ধরা সম্ভব নয় ভেবে তিনি তাঁর বক্তব্য সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পত্রিকা প্রকাশের কথা চিন্তা ভাবনা করেন। তাঁর উদ্দোগে গঠিত দাশ মেমোরিয়াল ফান্ডের সাহায্যে দেশবন্ধু প্রেস গড়ে তোলেন। ১৯২৫ সালে তিনি মুক্তি পত্রিকা নামে এক সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন।[১৩] এটি ছিল মানভূম জেলা থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন দেশাত্মবোধক গান, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে তিনি মানভূমবাসিকে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী মন্ত্রে উজ্জীবিত করতে থাকেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত তার রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'মুক্তি' 'কে বট' 'কে তুমি' 'জানো আমি কি' প্রভৃতি জনমানসে বহুল সাড়া জাগিয়েছিল।[১৪] এছাড়া তিনি 'গীতার কথা,' 'ধর্মকথা' প্রভৃতি পুস্তিকা রচনা করেন। তিনি মুক্তিপত্রিকার মধ্য দিয়ে কেবলমাত্র দেশ মুক্তির কথায় তুলে ধরেন নি, সেই সঙ্গে তিনি সমাজের সর্বস্তরের দাসত্ব থেকে মুক্তির কথাও বলেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি নারী মুক্তির কথাও উচ্চারণ করেছিলেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত তার লেখা 'নারীরক্ষা' 'জাতি গঠনে নারী শক্তি' প্রভৃতি প্রবন্ধ মানভূমের নারী জাগরণে বিশেষ সহায়ক ছিল। ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে পড়ে এই পত্রিকার উপর বারবার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল।

১৯২৫-২৬ সালে কলকাতা, বিহারসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিলে স্থানীয় নেতারা দাঙ্গা প্রতিরোধে তৎপরতা দেখান। ১৯২৬ সালে মানভূম জেলার ঝালদায় নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে 'যুব সমিতি' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১৫] সত্যকিংকর দত্ত এই সংগঠনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এই সংগঠন সহ জেলার আরো কয়েকটি সংগঠন দাঙ্গা প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বিহারের মুঙ্গের, গয়া, পাটনা প্রভৃতি এলাকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল। মানভূমে দাঙ্গার পরিণতি খুব একটা ভয়াবহ ছিল না। মন্দির- মসজিদের সামনে নানা অপ্রীতিকর ঘটনা হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের দুরত্ব বৃদ্ধি করেছিল। সাময়িক ভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হলেও উক্ত সংগঠন গুলির তৎপরতায় তা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

১৯২৮ সাল নাগাদ সাইমন কমিশন ও নেহেরু রিপোর্টকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। এই সময় নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত সমাজের মেরুদন্ড নারী শক্তিকেও আন্দোলনে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন নারীদের বাদ দিয়ে আন্দোলনে সফলতা পাওয়া সম্ভব নয়। তাঁরই উদ্যোগে ১৯২৮ সালে মানভূমের মহিলারা এক বৈঠকে মিলিত হন।[১৬] ক্ষীরদা সুন্দরী দেবী, বাসন্তী দেবী, লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, কমলা ঘোষ, শেফালিকা বসু, শান্তা মাহাতো, ভবানী মাহাতো, প্রমুখ নারীরা দলে দলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। মানভূম কংগ্রেসের প্রথম

রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল রামচন্দ্রপুর গ্রামে ১৯২৮ সালে।[১৭] এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত ও অন্নদা কুমার চক্রবর্তী এই সম্মেলন সাফল্যমন্ডিত করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতি সারা মানভূম জেলায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। মানভূমের হাজার হাজার জনসাধারণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সুভাষ চন্দ্র বসুর জ্বালাময়ী বক্তৃতা মানভূমের জনমানসে ব্যাপক উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত ১লা আগস্ট পুরুলিয়ার পৌরসভায় তিলক স্মরণে আয়োজিত সভায় প্রথম ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।[১৮] ফলে মানভূমে ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা আরও মজবুত হয়ে ওঠে। এই বছরেই মুক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিপ্লব' শীর্ষক শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখার দায়ে নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের এক বছরের কারাদণ্ড হয়।[১৯] কারামুক্ত হয়ে পুনরায় দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৯ সালের জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারাকে তীব্রতর করেছিল। ২৬ শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করার উদ্দেশ্যে মানভূমের বিভিন্ন এলাকায় কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল। তবে ব্রিটিশ পুলিশও হাত গুটিয়ে বসে ছিল না, তারা সব সময় বিভিন্ন কার্যপ্রণালী বানচাল করে দিত।

লবন আইন ভঙ্গ করে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করলে সারা দেশব্যাপী পুনরায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক পতাকা তলে সমবেত হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক সম্প্রদায় সকলেই এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। মানভূম জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বিপুল উৎসাহ নিয়ে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। ঝালদায় আয়োজিত এর প্রচার সভায় নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত সভাপতি এর ভাষণে জনগণকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে জেলার পপপ্রথম শহীদ সত্যকিঙ্কর দত্তের হত্যার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৯৩০ সালে ১০ই এপ্রিল 'মানভূম জেলার সত্যাগ্রহ কমিটি' গঠিত হয়।[২০] উদ্দেশ্য ছিল আইন অমান্য আন্দোলনকে সফল করা। এই কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত ও অতুলচন্দ্র ঘোষ। কাছাকাছি সমুদ্র উপকূল না থাকায় মানভূম কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী দুটি দলে বিভক্ত হয়ে নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্তের নেতৃত্বে একটি দল কাঁথিতে, অন্যটি অতুল চন্দ্র ঘোষ এর নেতৃত্বে ২৪ পরগনার সমুদ্র উপকূলে লবণ আইন তৈরি করে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন।[২১] তাঁরা লবণ তৈরি করেই ক্ষান্ত থাকেননি, সেই সঙ্গে তৈরি করা লবণ বাজারে বিক্রয়জাত করারও উদ্যোগ নেন। স্বাভাবিকভাবে পুরুলিয়া শহরে লবণ বিক্রয়ের শোভাযাত্রা শুরু হয় এবং এই শোভাযাত্রায় পুরুষদের পাশাপাশি লাবণ্যপ্রভা ঘোষের নেতৃত্বে নারীরাও সামিল হয়েছিলেন। এই সময় নারী সত্যাগ্রহ বাহিনী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ধানবাদে অনুষ্ঠিত মানভূম কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে নিবারণ চন্দ্র সভাপতিত্ব করেন।[২২] এই সম্মেলনে বিদেশি দ্রব্য বর্জন, পিকেটিং, দেশীয় শিল্পের উন্নয়ন, চরকায় সুতা কাটা প্রভৃতির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। আইন অমান্য আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে পুলিশের লাঠিচার্জ, গ্রেফতারি পরোয়ানা, খানা তল্লাশি ব্যাপকভাবে শুরু হয়। জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সাথে মানভূমের নেতৃবৃন্দ একে একে গ্রেফতার হতে থাকেন। নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত জুলাই মাসে ছয় মাসের জন্য হাজারীবাগ জেলে বন্দি হন। এই সময়

ব্রিটিশ সরকার আপস মীমাংসায় আসতে চাইলে প্রথম পর্যায়ের আন্দোলন স্থিমিত হয়ে পড়ে। ১৯৩১ সালে রঘুনাথপুরে নিবারন চন্দ্র দাশগুপ্ত ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের জন্য একটি বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু করেন।[২৩] তিনি মনে করতেন দুর্বলের একমাত্র হাতিয়ার হল সত্যাগ্রহ। প্রশিক্ষণ প্রার্থীরা এতটাই উৎসাহী ছিল যে পুরোপুরি প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার আগেই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুরু হলে তারাও সেই সত্যাগ্রহে যোগ দেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তি বা গোলটেবিল বৈঠক ভারতীয়দের খুশি করতে না পারায় ১৯৩২ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন শুরু হয়। নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়, শিউশরণ, রেবতী মোহন চট্টোপাধ্যায়, লাবণ্যপ্রভা ঘোষ প্রমূখ মানভূম কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ ব্যাপক ভাবে আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করলে ব্রিটিশ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের অভাবে শেষ পর্যন্ত আন্দোলন স্থিমিত হয়ে পড়ে।

১৯৩৩ সাল নাগাদ নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে প্রথমে ঢাকা তারপর রাঁচিতে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্নেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় ও ডাক্তার যদু গোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর চিকিৎসা করেন।[২৪] রাঁচিতে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন গান্ধীজী তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যমুনালাল বাজাজ তাঁর চিকিৎসার যাবতীয় খরচের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুসারে মানভূমের শিল্পাশ্রমে তাকে নিয়ে আসা হয় এবং ১৯৩৫ সালের ১৭ জুলাই সেখানেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।[২৫] তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানভূম জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। সারা মানভূম জেলায় শোকের ছায়া নেমে আসে। গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র, রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ তাঁর মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করেন। সুভাষচন্দ্র বসু অন্নদা কুমার চক্রবর্তীর নিকট প্রেরিত শোকবার্তায় লেখেন "... নিবারণ বাবুর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। এমন একটি খাঁটি মানুষ সহজে মেলে না তাঁকে হারিয়ে দেশ যে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা বলায় বাহুল্য। পুরুলিয়াবাসী সে ক্ষতি বেশ উপলব্ধি করলেও আমরাও কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি... "।[২৬] অন্নদা কুমার চক্রবর্তী লিখলেন কবিতা– "সন্ন্যাসীর চিত্ত লয়ে পশিয়া সংসারে দু পায়ে দলিয়া বিত্ত, বিভব, বাসনা। সর্বস্ব করিলে দান জননীর তরে, বরি নিলে দুঃখ-কষ্ট-বঞ্চনা-যন্ত্রণা।...আমরা পাইয়াছিনু মূর্তিমতী গীতা। সে গীতা লইলো কাড়ি শ্মশানের চিতা।"[২৭] ১৯৩৮ সালে গান্ধীজী 'হরিজন সেবক' এ নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত কে 'হরিজন দের সবচেয়ে বড় সেবক ও দীনহীনের পরম বন্ধু' বলে উল্লেখ করেছেন।[২৮]

উপসংহার

মানভূমে জাতীয়তাবাদের উদগাতা ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের আজীবন সংগ্রাম মানভূম তথা বিহার প্রদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিনিই প্রথম ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মানভূমের জনগণকে জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত করে সংগঠিত আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর সংগ্রাম শুধুমাত্র বিদেশীদের বিরুদ্ধেই ছিল না, দেশমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সামাজিক সমস্ত ধরনের শৃংখল থেকে মুক্তি, নারী মুক্তি, সমস্ত ধরনের দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রভৃতির জন্যও লড়াই করে গেছেন। তাঁর স্মরণে রাঁচির অনন্তপুর 'নিবারণপুর' নামে পরিচিত হয়।[২৯] এই জেলার বান্দোয়ান ও ভূতামে তাঁর

নামাঙ্কিত দুটি বিদ্যালয় যথাক্রমে বান্দোয়ান ঋষি নিবারণচন্দ্র বিদ্যাপীঠ এবং ভূতাম ঋষি নিবারণচন্দ্র বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩০] শ্রীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ভূতাম এ প্রতিষ্ঠা করেন নিবারণ আশ্রম। পুরুলিয়া শহরের সাহেব বাঁধের নামকরণ করা হয় 'নিবারণ সায়ের' যদিও সাহেব বাঁধ নামটিই অধিক পরিচিত। এছাড়া পুরুলিয়া শহরে তাঁর নামে একটি রাস্তা রয়েছে। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন জাতীয় স্তর থেকে আঞ্চলিক স্তর সর্বত্র বহু নেতৃত্বের জন্ম দিয়েছে। তাঁদের ত্যাগ, তিতিক্ষা, কর্মনিষ্ঠা, জীবনের ঝুঁকি জাতীয় নেতৃবৃন্দের থেকে কোন অংশে কম ছিল না। নিঃসন্দেহে মানভূম জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঋষি নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্তের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্বল্প পরিসরে তাঁর জীবন ও সংগ্রামের বিস্তারিত ইতিহাস অধরাই থেকে গেছে যা গবেষণার হাতছানিতে অবশ্যই উঠে আসবে।

তথ্য সূত্র নির্দেশিকা

১. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মানভূম জেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-১৯৪৭, সোনালী প্রেস, কলকাতা, ২০১৩, পৃ-৪২।

২. দিলীপকুমার গোস্বামী, মানভুমের স্বাধীনতা আন্দোলন, পারিজাত প্রকাশনী, পুরুলিয়া, ২০১০, পৃ- ১৮৪

৩. তদেব, পৃ- ১৮৪।

৪. স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী, আমার জীবন, কলকাতা, ২০১০, পৃ- ২৯২।

৫. অমীয় কুমার সেনগুপ্ত, মানভূমের স্মরণীয় যারা(১ম খন্ড), মানভূম সংবাদ, পুরুলিয়া, ২০০৬, পৃ- ৪৪।

৬. তদেব, পৃ- ৪৪।

৭. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ- ১১৪।

৮. জয়ন্ত কুমার ডাব, অভিভক্ত পুরুলিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (১৯২১-১৯৪৭) ফিরে দেখা, গীতা প্রিন্টার্স, কলকাতা, ২০০৮, পৃ- ২৩।

৯. অমীয় কুমার সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ- ৪৫।

১০. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ- ১২৯।

১১. তদেব, পৃ- ১৩৫।

১২. জয়ন্ত কুমার ডাব, পূর্বোক্ত, পৃ- ৩৩।

১৩. মুক্তি (মানভূমের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা), ৬(২৩), ১৭, ৭ ,১৯৩৯, পৃ- ৫।

১৪. অমীয়কুমার সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ- ৪৫।

১৫. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৪৪।

১৬. তদেব, পৃ- ১৫২।

১৭. Birendra Kumar Bhattacharya and others, West Bengal District Gazetteer Purulia, 1985, p-104.

১৮. মুক্তি, ৩(৩৩), ৬, ৮, ১৯২৮, পৃ- ৫-৬।

১৯. ঐ, ৩(৪৭), ৩,১২, ১৯২৮, পৃ- ৩-৫।

২০. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৬৩।

২১. জয়ন্ত কুমার ডাব, পূর্বোক্ত, পৃ- ৬০।

২২. K. K. Dutta, History of Freedom Movement in Bihar 1857-1947, Govt. Of Bihar, Patna, 1957, p-83

২৩. অমীয় কুমার সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৫।

২৪. দিলীপ কুমার গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ-১৯০।

২৫. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ-১৭৬।

২৬. স্বামী আসীমানন্দ সরস্বতী, পূর্বোক্ত, পৃ-২৯২।

২৭. তদেব, পৃ-২৯২।

২৮. অমীয় কুমার সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৫।

২৯. দিলীপ কুমার গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ-১৯০।

৩০. তদেব, পৃ-১৯১।

বিরসা মুন্ডার ধর্মীয় চেতনা ও মুন্ডা বিদ্রোহে এর প্রভাব

ডঃ রত্না পাল
সহকারী অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ
বিরসা মুন্ডা কলেজ, হাতিঘিষা, দার্জিলিং

সারসংক্ষেপ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহ ইংরেজ শাসকদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিল বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে মুন্ডা বিদ্রোহ। এই 'উলগুলান' (প্রবল বিক্ষোভ) ছিল জমির উপর অধিকার রক্ষার লড়াই। বিংশ শতাব্দীতে ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যে রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় তা প্রকৃতপক্ষে ছিল পূর্ববর্তী বিবিধ আন্দোলনের এক সুসংগঠিত প্রকাশ। জমির উপর অধিকার অন্যায় ভাবে কেড়ে নেওয়া তথা তাদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে বিরসা ও তাঁর অনুগামীরা স্বাধীনতার লড়াই এ সামিল হয়েছিল। যদিও আন্দোলনের মূল চরিত্র ছিল রাজনৈতিক, তবে এই আন্দোলন মূলত ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে শুরু হয়েছিল। তিনি মুন্ডাদের চিরাচরিত ধর্মকে সংস্কার করতে এগিয়ে আসেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল ধর্মীয় অজ্ঞতা, অশিক্ষা মুন্ডাদের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ। তিনি নানাবিধ ধর্মীয় রীতিনীতি প্রবর্তন করেন, এছাড়া তাঁর জীবনে কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল যেগুলি ক্রমশ মুন্ডাদের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়। বিরসার অনুগামীরা বিরসাইত বলে পরিচিতি লাভ করে। বিরসা মুন্ডা যদিও ব্রিটিশ সরকারের সাথে লড়াইয়ে সফল হননি। কিন্তু তাঁর ধর্মীয় সংস্কার মুন্ডাদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

শব্দ সূচকঃ ছোটনাগপুর, বিরসা মুন্ডা, খ্রিস্টান মিশনারি, ধর্মীয় সংস্কার, ব্রিটিশ সরকার, বিরসাইত

দক্ষিণ বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চল ছিল বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা, যাদের মধ্যে মুন্ডারা ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠ। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে মুন্ডা জাতির অবিসংবাদী নেতা বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে মুন্ডা বিদ্রোহ এক ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। লোহারডগা জেলার খুন্তি থানা ছিল মুন্ডা বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল।[১] এটি ছিল মূলত কৃষক বিদ্রোহ, মুন্ডারা ছিল কৃষক এবং জমির উপর বংশপরম্পরায় অধিকার ভোগ করত। তারা জঙ্গল পরিষ্কার করে জমিকে চাষাবাদ যোগ্য করে তুলেছিল। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা এতদ্ অঞ্চলে স্থাপিত হওয়ার পর বিভিন্ন বহিরাগত (আদিবাসীরা এদের 'দিকু' বলত) যেমন ঠিকাদার, জায়গীরদার, জমিদার, মহাজন প্রভৃতিরা ছলে-বলে-কৌশলে তাদের জমি দখল করতে থাকে, জমির উপর কর্তৃত্ব হারিয়ে অন্যান্য আদিবাসীদের মতো মুন্ডারাও ক্রমশ প্রান্তিক পর্যায়ে চলে যায়। তাদের প্রশমিত ক্ষোভ ধীরে ধীরে বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে ভূমিহীন মুন্ডারা বিদ্রোহ শুরু করেছিল কিন্তু তা নিষ্ঠুর ভাবে দমন করা হয়। এরপর নব্বইয়ের দশকে শুরু হয় তীব্র আন্দোলন, নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন কুড়ি বছরের যুবক, বিরসা মুন্ডা। সুতরাং বিরসা মুন্ডার বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ ও তার সহযোগীদের প্রতি মুন্ডা জনগোষ্ঠীর তীব্র ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। আপাত দৃষ্টিতে বিদ্রোহের চরিত্র রাজনৈতিক মনে হলেও অর্থাৎ

তা রাজনৈতিক রূপ নিলেও বিরসা মুন্ডার আন্দোলন মূলত ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে শুরু হয়েছিল। বিরসা বিদ্রোহের ধর্মীয় চরিত্রকে তুলে ধরাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

অন্যান্য আদিবাসীদের মতো মুন্ডারাও প্রকৃতি পূজায় বিশ্বাসী ছিল। সিঙবোঙ্গা ছিল তাদের প্রধান উপাস্য দেবতা, এছাড়াও তারা সিঙবোঙ্গার বিভিন্ন অবতারের সাধনা করতো। তারা অপদেবতার অস্তিত্ব, ডাইনি প্রথা, জাদুবিদ্যা, ভূতপ্রেত এসবে প্রবল বিশ্বাসী ছিল। নানা প্রকার জন্তু-জানোয়ারদের বলি দিত বিভিন্ন অপদেবতা ও নিজেদের পূর্বপুরুষদের তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে।[২] অজ্ঞানতা, অশিক্ষা ও অজ্ঞতার দরুণ মুন্ডারা নানাবিধ ধর্মীয় ও সামাজিক কু-প্রথা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল।

ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে খ্রিস্টান মিশনারিরাও এদেশে এসেছিল ধর্ম প্রচার করতে। জার্মান ইভানজেলিক্যাল লুথেরানরা ১৮৪৫ সালে প্রথম ছোটনাগপুর অঞ্চলে এসেছিল পরে রোমান ক্যাথলিক ও অন্যান্য মিশনারিরা আসে।[৩] এতদ্ অঞ্চলের আদিবাসীদের অশিক্ষা ও ধর্মীয় কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে মিশনারিরা তাদের নানাভাবে ধর্মান্তরিত করার প্রয়াস নেয়। আদিবাসীদের তারা বোঝায় যে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলে তারা তাদের হারানো জমি ফিরে পাবে - এই ব্যাপারে মিশনারিরা তাদের সহায়তা করবে। এছাড়া মিশনারিরা ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে আদিবাসীদের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করার ব্যবস্থা করে। অন্যান্য অনেক মুন্ডাদের মতো তামার থালার চালকাদ গ্রামের অধিবাসী বিরসা'র বাবা সুগানা মুন্ডা খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হন এবং বিরসা মিশনারি স্কুলে পড়ার সুযোগ পায়। সে পাঁচ বছর চাঁইবাসার মিশনারি স্কুলে পড়াশোনা করে ইংরেজিতে কিছুটা সড়গড় হয়। তবে খ্রিস্টান মিশনারিদের আদিবাসীদের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অপমান জনক মন্তব্য তাকে ব্যথিত করে এবং সে মিশন ছেড়ে বেরিয়ে আসে এবং খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করে।[৪]

মুন্ডা অধ্যুষিত অঞ্চলে হিন্দু জনগোষ্ঠীরও বসবাস ছিল এবং চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব এই অঞ্চলে পড়েছিল। আনন্দ পাণ্ডে নামক জনৈক বৈষ্ণব সাধকের সংস্পর্শে এসে বিরসার জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটে। তুলসী গাছের পূজা, কপালে তিলক কাটা, উপবীত ধারণ, নিরামিষ ভোজন, খড়ম পরা প্রভৃতি রীতিনীতি গ্রহণ করেন তিনি। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে বিরসা হিন্দু ধর্মের সারমর্ম উপলব্ধি করেন। বিরসা ছাড়াও আরও অনেক মুন্ডারা বৈষ্ণব ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।[৫] বিরসা হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মের ভালো দিকগুলোকে গ্রহণ করে মুন্ডাদের আদি ধর্মকে সংস্কার করতে এগিয়ে আসেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মুন্ডাদের পিছিয়ে পড়া, তাদের দুঃখ-দুর্দশা তথা তাদের উপর বহিরাগতের আধিপত্যের মূল কারণ তাদের অজ্ঞানতা, অশিক্ষা ও ধর্মীয় কুসংস্কার। তাই সেগুলি দূর করার জন্য বিরসা নানাবিধ নিয়ম চালু করেন।[৬]

ক. তিনি মুন্ডাদের বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা না করে কেবল মাত্র সিঙবোঙ্গার উপাসনা করতে বলেন, অর্থাৎ একেশ্বরবাদের প্রচার করেন। এছাড়া দেবতার উদ্দেশ্য প্রার্থনার উপর জোর দেন।

খ. মুন্ডারা বিশ্বাস করতো দুর্ভিক্ষ, মড়ক, অজন্মা, পীড়া – এছাড়া অন্যান্য সকল দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী বিভিন্ন অপদেবতা, যারা তাদের উপর রুষ্ট হয়ে এগুলো ঘটান। বিরসা তাদের মন থেকে এসবের ভয় দূর করতে বলেন এবং তাদের মনে বিশ্বাস জাগানোর জন্য তিনি নিজে মন্ত্রশক্তির অধিকারী এবং ভূতপ্রেতকে তাড়াতে পারেন একথা প্রচার করেন। ফলতঃ মুন্ডারা বিপদে পড়লেই বিরসাকে ডাকতে

শুরু করে, তিনি তাদের বিপদ থেকে রক্ষা করতেন এইভাবে মুন্ডাদের মধ্যে বিরসার গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে।

গ. মুন্ডারা তাদের বিভিন্ন দেবতা ও অপদেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য নানা রকম পশুপাখির বলি দিত, বিরসা তাদের এই বলিদান থেকে বিরত থাকতে বলেন।

ঘ. তিনি মুন্ডাদের বলেন গরু এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশুকে হত্যা না করতে।

ঙ. তিনি মুন্ডাদের নিরামিষ ভোজনের নির্দেশ দেন।

চ. বিরসা মুন্ডাদের মাদক দ্রব্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেন যা তাদের শারীরিক ভাবে ধীরে ধীরে অক্ষম করে দেয়।

ছ. বিরসা আদিবাসীদের প্রত্যেকের বাড়িতে তুলসি গাছ পোঁতা, প্রত্যেককে উপবীত ধারণ করা, নিজেকে এবং ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখা, গুরুজনদের সম্মান করা – প্রভৃতি পালনের কথা বলেন।

জ. সপ্তাহে ছয় দিন কায়িক পরিশ্রম করা ও একদিন ধর্ম ও প্রার্থনায় কাটানোর কথা বলেন।

বিরসা যে সমস্ত মূল্যবোধের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন, সেগুলি হল – সৎ এবং সত্যবাদিতা, মুন্ডাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষা করা, পরিবেশ সচেতনতা, মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি।[৭] মুন্ডাদের জন্য পালনীয় রীতিনীতিগুলি ক্রমশ এক নতুন ধর্মের রূপ নেয়, বিরসার নিজস্ব ধর্মীয় সত্তা ও দর্শনের বিকাশ ঘটে। আদিবাসীদের কাছে তাঁর ধর্ম অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। আদিবাসীদের তিনি খ্রিস্ট ধর্ম ত্যাগ করতে আহ্বান করেছিলেন।[৮] তাঁর অনুগামীরা বিরসাইত বলে পরিচিতি লাভ করলো। বিরসাইতদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং বিরসা তাঁর অনুগামীদের নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে বা পাহাড়ের চূড়ায় সভা করতেন। কোনো এক সভায় বিরসা বলেছিলেন, ''দেহের মৃত্যু ঘটে, আত্মার নয়।''[৯] সুতরাং তাঁর কথার মধ্যে আমরা বেদ, উপনিষদ বা ত্রিপিটকের দার্শনিক সুলভ মন্তব্যের পরিচয় পাই। খ্রিস্ট ধর্মের মতো তিনি প্রচারক নিয়োগ করেন যারা বিরসার বাণী এবং ধর্মের অনুশাসনগুলি প্রচার করতো।

শুধু ধর্ম প্রচার নয় এসময় বিরসার জীবনে কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল যেগুলি মুন্ডাদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়িয়ে দেয়। যেমন কোনো এক বছরে মে-জুন মাসে বিরসা তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বজ্রপাত শুরু হয়। বন্ধুটি লক্ষ করেন যে বিরসার শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, তাঁর মুখের রং কিছুক্ষণের জন্য বদলে লাল-সাদা রং ধারণ করেছিল। তাঁর এই আকস্মিক শারীরিক পরিবর্তনের কথা বন্ধুটি এবং বিরসা নিজেও এভাবে প্রচার করেন যে, তিনি যেন স্বর্গাদেশ পেয়েছেন ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন।[১০] ধীরে ধীরে লোকমুখে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো।

চতুর্দিক থেকে মুন্ডা, ওরাওঁ, খড়িয়ারা দলে দলে তাকে দেখতে ছুটে আসে।[১১] একদিন এক মহিলা তার অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে বিরসার কাছে আসেন। বিরসা সেই ছেলেটিকে স্পর্শ করেন, মন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং নিজের হাত তার মাথার উপরে রাখেন, ছেলেটি কিছুদিন বাদে সুস্থ হয়ে ওঠে এবং সেই মহিলা প্রচার করেন যে বিরসার প্রার্থনার জন্যই তিনি নিজের সন্তানকে ফেরত পেয়েছেন।[১২] বিরসা

তাঁর অনুগামীদের বলতেন যে, যদি তারা তাকে বিশ্বাস করে তাহলে তিনি তাদের সকল দুঃখ-কষ্ট দূর করতে সক্ষম। ক্রমশ মুন্ডাদের কাছে বিরসা'র গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়, তারা তাঁকে ভগবানের দূত বলে মনে করল।

বিরসাও নিজেকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী রূপে দেখতে আগ্রহী ছিলেন। ধীরে ধীরে ভগবানের দূত ভগবানে পরিণত হল মুন্ডারা তাঁকে 'বিরসা ভগবান' বলতে লাগল। তিনি নিজেকে সিঙবোঙ্গার অবতার বলে ঘোষণা করলেন।[১৩] একবার বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হলে বিরসাকে তাঁর অনুগামীরা এক গ্রামে নিয়ে গেল, বিরসা রোগীকে এক ফাঁকা জায়গায় এনে শুইয়ে দিতে বললেন এবং নিজের উপবীত দিয়ে রোগীকে স্পর্শ করলেন, মন্ত্র আওড়ালেন, তারপর তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বললেন। অনেকে হয়তো সাধারণ ভাবে সুস্থ হয়ে যেত, কিন্তু বিরসার উপস্থিতি তাদের মানসিক ভাবে সাহস যোগাত এবং এই ধরনের ঘটনা তার অলৌকিক ক্ষমতার প্রচারে সাহায্য করে। বিরসাইতরা বিভিন্ন লোকসংগীতের মাধ্যমে বিরসার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ব্যক্ত করেন। এরকম কটি লোকসংগীতের ইংরেজি অনুবাদ হল—

ক) O, pray, tell me, how for is Chalkad? I shall go slowly
Some say, it is eastward, others say it is southward
O, I shall go to the South slowly.
The wild forest is infested with leopards and bears, and they make terrible sounds,
O, I shall go, together or slowly?
Birsa's words are pleasing, I too shall go and listen to them.[১৪]

সকলেই চালকাদ যাওয়ার জন্য উদগ্রীব, সকল রাস্তা যেন সেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, শ্বাপদসংকুল এলাকা, তাও বিরসা'র দর্শন পাওয়ার জন্য ও তাঁর কথা শোনার জন্য শারীরিক ভাবে অশক্ত, খোঁড়া, অন্ধ সকলেই অস্থির।

খ) In your childhood you grazed the goat and sheep,
You played in dust.
O Birsa, when you grew up, you went to your
maternal uncle's village,
You were initiated into the primers at Salga.
Your words filled our hearts
With happiness and strength.
Night and day they visit you,
You revealed the new religion; the old religion was discarded,
We would not take fish and flesh.
Deep amidst wild forest, on the brunt and cleared upland,

Singbonga entered your heart.[১৫]

ছোটবেলায় বিরসা ও অন্যান্য মুন্ডা শিশুদের মতো ছাগল ও ভেড়া চারণ করতো, ধুলো মেখে খেলত। বড় হয়ে তিনি এক নতুন ধর্মের প্রবর্তন করলেন, তাঁর অনুগামীরা মাছ-মাংস খাওয়া পরিত্যাগ করলো এবং তাদের মতে সিঙবোঙ্গা বিরসার হৃদয়ে প্রবেশ করেছে।

গ) You were appointed Father of the earth. I trust you
heart and soul. Save us in distress and difficulties.
In heaven is the Great King. He appointed you New King
on earth. .....
On earth the New King may vouchsafe me mercy
and protection, succour and strength and consign to
flames and wash away old Rajas, Officials, Zamindars.
with the water of the river and the fire of the forest
seize and destroy them completely.[১৬]

তাঁর অনুগামীরা বিরসাকে অন্তর থেকে বিশ্বাস করতো, তিনি তাদের দুঃখ ও বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। মুন্ডারা মনে করতো যে স্বর্গের মহান রাজা তাকে পৃথিবীর নতুন রাজা হিসেবে নিয়োগ করেছেন এই পৃথিবীর সকল অত্যাচারীদের শাস্তি দেওয়া ও ধ্বংস করার জন্য।

লোকসংগীতগুলো থেকে বিরসার কতটা প্রভাব তাঁর অনুগামীদের উপর পড়েছিল তা বোঝা যায়। তিনি ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে মুন্ডাদের ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। বিরসা ক্রমশ রাজনৈতিক আন্দোলনের পথে এগিয়ে যান। তিনি মনে করতেন মুন্ডারা সঙ্ঘবদ্ধ হলে বহিরাগতদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারবে, রুখে দাঁড়াতে পারবে এবং জমির উপর হারানো আধিপত্য ফিরে পাবে। তিনি তাঁর অনুগামীদের একত্রিত হয়ে সংগ্রামের জন্য আহ্বান জানান। বিরসাইতদের ধর্মীয় একতা, ঐক্যবদ্ধতা তাদের সাহস বাড়ায় ও আশান্বিত করে এবং দিকুদের হাত থেকে নিজেদের অধিকার রক্ষার লড়াই, হারানো জমি ফিরে পাওয়ার লড়াইয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আসলে বিরসা মুন্ডা আদিবাসীদের শোষণের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তাদের ধর্মীয় উত্তরণকে পথ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। বিরসা'র জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাঁর সভাগুলিতে ভিড় উপচে পড়তো। এই কারণে তাঁকে সরকার বাহাদুর নেক্ নজরে পড়তে হয়। ১৮৯৫ সালের কোনো একদিন চালকাদ-এর এক পাহাড়ে ছয় হাজার আদিবাসী সমবেত হয়েছিল। কারণ বিরসা বলেছিল পৃথিবী সেদিন ধ্বংস হবে এবং তার আশেপাশে যারা থাকবে তারাই শুধু রক্ষা পাবে।[১৭] এই জমায়েতই হয়ে দাঁড়ায় বিরসার প্রথমবার গ্রেপ্তারের কারণ। ওই বছরেরই ২৪ শে আগস্ট রাঁচির ডিসট্রিক্ট সুপারিন্টেনডেন্ট তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। বিরসা পুলিশ অফিসারকে বলেন, "I am preaching a new religion: how can government stop it?"[১৮] বিরসা বলতে চেয়েছিলেন যে তিনি কেবলমাত্র ধর্ম প্রচার করছেন, তারা কীভাবে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে। তখন পুলিশ অফিসার বলেন যে, তাঁর সভায় প্রচুর জনসমাগম হচ্ছে, উত্তরে বিরসা বলেছিলেন, জনগণ স্বেচ্ছায় সেখানে এসেছে

এক্ষেত্রে তাঁর কিছু করার নেই।[১৯] বিরসা জনগণকে ধর্মীয় উপদেশ দিচ্ছিলেন কিন্তু সরকার সেটিকে রাজনৈতিক সভা বলে ঘোষণা করে এবং তাঁকে বন্দি করা হয়। আসলে বিরসা'র নতুন ধর্ম প্রচার খ্রিস্টান মিশনারিদের মুন্ডাদের ধর্মান্তরকরণে চূড়ান্ত আঘাত হেনেছিল। ততদিনে মুন্ডারাও বুঝতে পেরেছিল যে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হলেও তারা তাদের হারানো জমি ফিরে পায়নি মিশনারিরা তাদেরকে লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করেছিল। অনেক ধর্মান্তরিত মুন্ডারা পুনরায় বিরসাইত ধর্মে ফিরে এসেছিল। মিশনারিরা বিরসা'কে 'fanatic' বলেছিল,[২০] তারা বিরসার কাজকর্মের বিচারে সরকারকে অবহিত করতো।[২১]

বিরসাকে দু'বছর অন্তরীন রাখা এবং পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করা হয়, কিন্তু জরিমানার টাকা না দিতে পাড়ায় তাঁর সাজা আরও ছয় মাস বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ব্রিটেনের মহারানীর ভারত শাসনকালের হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিরসা তাঁর সাজা পূরণের সময় সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই ১৮৯৮ সালের জানুয়ারি মাসে মুক্তি পান। মুক্তি পেয়েই তিনি পুনরায় বিরসাইতদের একত্রিত করেন, তাদের কাছে মুন্ডাদের পূর্বপুরুষদের গৌরবগাঁথা বর্ণনা করেন। তাদের মনে দেশপ্রেমের মনোভাব গড়ে তোলেন মুন্ডাদের অতীত ঐতিহ্য সংরক্ষণের আহ্বান জানান। তারা রাঁচির কাছাকাছি চুটিয়া গ্রামে যায়, সেখানে নাগাবংশী রাজাদের ১৬৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দির ছিল।[২২] সেখানে গিয়ে তারা মন্দিরের মূর্তিগুলি নষ্ট করে দেয় এবং বিরসা বলেন যেহেতু তারা সিঙবোঙ্গার উপাসক তাই এই মন্দিরে বহু দেবদেবীর মূর্তি রাখা যাবে না। ওই অঞ্চলের হিন্দুরা এতে রুষ্ট হন এবং পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় চারজন বিরসাইতকে গ্রেপ্তার করা হয় যদিও বিরসা পালিয়ে যান। গ্রেপ্তার হওয়া বিরসাইতরা বলে যে, যেহেতু এটি তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত মন্দির তাই বিরসার নির্দেশে তারা এটিকে পুনরুদ্ধার করতে এসেছিল।[২৩]

বিরসা বিভিন্ন গোপন ডেরায় তাঁর অনুগামীদের নিয়ে মুন্ডাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে সভা করতেন।[২৪] তিনি মুন্ডাদের অহিংস থাকার কথা বলতেন তবে প্রয়োজনে তীর-ধনুক ব্যবহার করার নির্দেশ দেন। সভায় লাল ও সাদা দুটি পতাকা রাখা হতো, সাদা পতাকা মুন্ডাদের এবং লাল পতাকা দিকুদের প্রতীক। দুটো পতাকা রাখা হতো দেখানোর জন্য যে দিকুদের রক্তে মুন্ডাদের পতাকা ও একদিন লাল হয়ে উঠবে।[২৫]

১৮৯৭ সালে ছোটনাগপুর অঞ্চলে অজন্মার দরুণ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং ১৮৯৮ সালে কলেরার প্রকোপও বৃদ্ধি পায়।[২৬] কিন্তু সরকার জনগণের দুর্দশার প্রতি পুরোপুরি উদাসীন থাকে। এমতাবস্থায় বিরসা ও তাঁর অনুগামীরা ব্রিটিশ সরকার, জমিদার, ঠিকাদার, মহাজন ও মিশনারিদের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামের ডাক দেন। ১৮৯৯ সালের নভেম্বর মাসে বিরসা তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন প্রচারককে সাথে নিয়ে দেওসা'র নবরত্ন ভবনে যান, সেখান থেকে 'বীরদা' (পুন্যবারি) নিয়ে আসেন এবং তাঁর অনুগামীদের গায়ে ছিটিয়ে দেন। তিনি বলেন যে, এখন থেকে শক্তিতে তাদের সমকক্ষ কেউ হতে পারবে না।[২৭] সুতরাং বিরসার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ধর্ম সবসময় যুক্ত থাকতো।

১৮৯৯-এর খ্রিস্ট জন্মদিনের পূর্বদিন অর্থাৎ ২৪শে ডিসেম্বর মুন্ডাদের 'উলগুলান' (অভ্যুত্থান)-এর দিন ঘোষণা করা হয়। রাঁচি, খুন্তি, তামার, বাসিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বিরসাইতরা দিকুদের আক্রমণ শুরু করে। তাদের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ ছিল খ্রিস্টান মিশনারিরা, রাঁচি থেকে চক্রধরপুর পর্যন্ত জায়গায় বিরসাইতরা খ্রিস্টান মিশনারিদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়।[২৮] মুরহু'র অ্যাংলিক্যান মিশনারি এবং সারওয়াদা'য় রোমান ক্যাথোলিক মিশনারিদের উপর তারা আক্রমণ করে। এরপর বিরসাইতরা বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ চৌকি আক্রমণ করে ও পুলিশ কর্মীদের হত্যা করে।[২৯] ছোটনাগপুর ডিভিশনের পুলিশ কমিশনার ও রাঁচির ডেপুটি কমিশনার ১৫০ জনের পদাতিক বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে যান, প্রচুর সংখ্যক মুন্ডা বিদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিরসা'র কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিলো না, অবশেষে গুপ্তচর লাগিয়ে তাঁকে ৩রা ফেব্রুয়ারি সিংভূমের এক ঘন জঙ্গল থেকে গ্রেপ্তার করা হয় ও রাঁচির জেলে নিয়ে আসা হয়। সেখানে ১৯০০ সালে ৯ই জুন বিরসার মৃত্যু হয়, যদিও মুন্ডাদের বিশ্বাস তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে।

বিরসার মৃত্যু হলেও তাঁর ধর্মের মৃত্যু হয়নি। বিরসাইতরা বিশ্বাস করতো যে তিনি আবার ফিরে আসবেন। ১৯১১ সালের জনগণনায় রাঁচি জেলায় কেবলমাত্র ১৫ জন বিরসাইতের কথা বলা আছে,[৩০] সম্ভবত এই জনগণনায় কোনো কোনো জায়গায় বিরসাইতদের প্রকৃতি পূজারক (animist) হিসেবে দেখানো হয়েছে।[৩১] ১৯৬০ সালে দশ হাজার জন বিরসাইতের সন্ধান পাওয়া যায় সিংভূমের পোড়াহাট, খুন্তি ও রাঁচি এলাকায়।[৩২] তারা বিরসা'র মতাদর্শে বিশ্বাস করতো, মুন্ডাদের প্রচলিত সরনা ধর্ম থেকে তাদের ধর্ম ছিল আলাদা, রীতিনীতি ছিল ভিন্ন। তবে পরবর্তী জনগণনায় ধর্মের ক্ষেত্রে বিরসাইত বলে কোনো উল্লেখ নেই, তাদের সম্ভবত অন্যান্য (other) হিসেবে দেখানো হয়েছে। তবে একথা ঠিক যে বিরসা ও তাঁর ধর্মের প্রভাব সমগ্র মুন্ডা আদিবাসীদের মধ্যে চিরদিন থাকবে যা তাদের জীবনকে নতুন দর্শনে প্রভাবিত করেছিল। মুন্ডাদের জীবনে তাঁর আবির্ভাব এমন একটি সময়ে হয়েছিল যখন তাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবন এক গভীর সংকটের সম্মুখীন, বিরসার লড়াই ছিল মুন্ডাদের ন্যায় ও ন্যায্য অধিকারের লড়াই।

যদিও ভারতবর্ষের ধর্মীয় ইতিহাস বা ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে বিরসা মুন্ডা কোনো স্থান গ্রহণ করতে পারেননি কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তিমলগ্নে তিনি যে মুন্ডাদের মধ্যে কিছুটা হলেও ধর্মীয় সংস্কার তথা জাগরণ ঘটাতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর ধর্ম, জীবন ধারণের পন্থা অনুসরণ করে এবং তাঁর নেতৃত্বে মুন্ডারা ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ ঘটিয়ে 'মুন্ডারাজ' প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিরসা সংগঠিত ভাবে কোনো পদক্ষেপ নেননি, পরিস্থিতিই তাঁকে প্রথমে ধর্মীয় সংস্কার এবং পরে রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করেছিল। তিনি শোষিত, নিপীড়িত মুন্ডাদের নতুন ভাবে বাঁচার পথ দেখিয়েছিলেন। সুতরাং বিরসা বিদ্রোহের ধর্মীয় দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা মুন্ডাদের মধ্যে সাহস এবং শক্তি জুগিয়েছিল।

তথ্য সূত্র নির্দেশিকা

১. Sarat Chandra Roy, The Munda and Their country, The Kuntaline Press, Calcutta, 1912, p. Lxxxii

২. Surendra Prasad Sinha, Life and Times of Birsa Bhagwan, Bihar, Tribal Research Institute, Ranchi, 1964, p. 72

৩. Alpa Shah, Religion and the Secular Left: Subaltern Studies, Birsa Munda and the Maoists, Anthropology of this Century, Issue 9, AOTC Press, London, 2014 (http://aotcpress.com/author/alpa-shah Retrieved on 01.11.2022)

৪. Gopi Krishna Kunwar, The life and times of Birsa Munda, Prabhat Books, New Delhi, 2013, p. 37

৫. Surendra Prasad Sinha, op. cit, p. 74

৬. Ibid, pp. 75-77

৭. V.K. Sunwani and B.K. Panda, Search of Values from the Lives of Great Men, Regional Institute of Education, Bhubaneswar, 2003, p. 147

৮. Dr. VijayaKumari. K, Rerhinking the Relevance of Birsa Munda in the History of Tribal Movement with reference to the Impact on the Minds of Tribal Population, in Life and Movements of Birsa Munda, E-Book, Dr. Manoj Sahare(ed.), Late N.A. Deshmukh Arts and commerce College, Chandur Bazar, Amravati, Maharastra, 2021, p. 30

৯. Surendra Prasad Sinha, op. cit, p. 77

১০. Sarat Chandra Roy, op. cit, p. 326

১১. K. S. Singh, Birsa Munda and His Movement 1874-1901, A Study of a Millenarian Movement in Chotanagpur, Oxford University Press, Oxford, 1983, p. 52

১২. Ibid, p. 47

১৩. S. P. Sinha, Nature of Religion of Birsa(1895-1900), in Aspects of Religion in Indian Society, L. P. Vidyarthi(ed.), Kedar Nath Ram Nath, Meert, 1961, p. 320

১৪. Ibid, pp. 52-53

১৫. Ibid, p. 277

১৬. Ibid, p. 287

১৭. Alpa Shah, op. cit

১৮. K. S. Singh, op. cit, p. 63

১৯. Ibid

২০. Alpa Shah, op. cit

২১. K. S. Singh, op. cit, p. 60

২২. M. G. Hallet, Bihar and Orissa District Gazetteers, Ranchi, Superintendent, Government Printing, Bihar and Orissa, 1917, p. 27

২৩. Surendra Prasad Sinha, op. cit, p. 81

২৪. K. K. Datta, History of the Freedom Movement in Bihar 1857-1920, Vol. One, Government of Bihar, Patna, 1957, p. 100

২৫. Surendra Prasad Sinha, op. cit, p. 84

২৬. S. C. Roy, op. cit, p. 336

২৭. Ibid, p. 328

২৮. L.S.S. O'Malley, Census of India, Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim, Vol. V, Part 1, Royal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1913, p. 216

২৯. M. G. Hallet, op. cit, p. 51

৩০. Ibid, p. 91

৩১. L. S. S. O Malley, op. cit, p. 214

৩২. K. S. Singh, op. cit, p. 149

স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ব ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্যবাদী আদর্শের প্রবেশ (১৮৭১-১৯৩৪)

কৌশিক চক্রবর্তী
রাজ্য পোষিত কলেজ শিক্ষক (SACT)
ইতিহাস বিভাগ
আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

১৫ই আগস্ট, ২০২২ সালে ভারতের ৭৫ তম স্বাধীনতা বর্ষপূর্তি ও স্বাধীনতার ৭৬ তম বর্ষ মহাসমারহে উদযাপিত হয়েছে। এই শুভলগ্নে দেশের অতীত গৌরব তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের জয়গাঁথা স্মরন করা একান্ত কর্তব্য। ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আমি এই লেখনীতে স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ব ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্যবাদী তথা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের উদ্ভব ও প্রবেশ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ব ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্যবাদী তথা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রবেশ নিয়ে আলোচনায় আমাদের ১৮৭০ এর দশক থেকে শুরু করে ১৯৩০ এর দশক পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিক আন্দোলন ও আদর্শগত সংঘাতের অবিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী আলোচনা করা প্রয়োজন। ১৮৭১ সালে তৎকালীন কলিকাতার কিছু সমাজতান্ত্রিক যুবকের সাম্যবাদের জনক কার্ল মার্ক্সের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা; 'প্রথম আন্তর্জাতিক' নিয়ে পূর্ব ভারতীয় যুবকদের আবেগ পরবর্তীতে সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ করা যায়। পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রাশিয়াতে (১৯১৭) সফল হওয়ার বহু আগেই পূর্ব ভারতের যুবকরা ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক-সাম্যবাদী আদর্শে দীক্ষিত হয় এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আশা বুকে নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মলগ্ন (১৮৮৫) থেকেই দলের মধ্য সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থকদের উপস্থিতি ও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৯২০ এর দশকে কম্যুনিস্ট পার্টি গঠনের প্রচেষ্টার শুরু থেকে ১৯২৫ এ ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির ভারতের মাটিতে আগমন সর্বক্ষেত্রে পূর্ব ভারতীয় যুবকদের উপস্থিতি বেশী চোখে পরে। পরবর্তীতে সমাজতান্ত্রিক দলের নেতৃত্ব, সাম্যবাদের ভাবধারা বিস্তারের উদ্যোগ, ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে এই অঞ্চলের মানুষের অবদান অনস্বীকার্য। সুতরাং স্বাধীনতা সংগ্রামে সাম্যবাদী আদর্শের প্রবেশ এই অঞ্চলের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

শব্দ সূচকঃ ভারতীয় সমাজতন্ত্রবাদ, বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, শূদ্র জাগরণ, স্বদেশী আন্দোলন, অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ

ভূমিকা

১৫ই আগস্ট, ২০২২ সালে ভারতের ৭৫ তম স্বাধীনতা বর্ষপূর্তি ও স্বাধীনতার ৭৬ তম বর্ষ মহাসমারহে উদযাপিত হয়েছে। এই শুভলগ্নে দেশের অতীত গৌরব তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের জয়গাঁথা

স্মরন করা একান্ত কর্তব্য। ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আমি এই লেখনীতে স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ব ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্যবাদী তথা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের উদ্ভব ও প্রবেশ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। যদিও বিষয়টির ব্যাপ্তি স্বল্প আলোচনায় তুলে ধরা কষ্টসাধ্য। স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ব ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্যবাদী তথা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রবেশ নিয়ে আলোচনায় আমাদের ১৮৭০ এর দশক থেকে শুরু করে ১৯৪৭ এর স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী আলোচনা করা প্রয়োজন। ১৮৭১ সালে তৎকালীন কলিকাতার কিছু সমাজতান্ত্রিক যুবকের সাম্যবাদের জনক কার্ল মার্ক্সের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা, 'প্রথম আন্তর্জাতিক' নিয়ে পূর্ব ভারতীয় যুবকদের আবেগ পরবর্তীতে সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ করা যায়। পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রাশিয়াতে(১৯১৭) সফল হওয়ার এক যুগ আগেই পূর্ব ভারতের যুবকরা সাম্যবাদী আদর্শে দীক্ষিত হয় এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আশা বুকে নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মলগ্ন (১৮৮৫) থেকেই দলের মধ্য সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থকদের উপস্থিতি ও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৯২০ এর দশকে কম্যুনিস্ট পার্টি গঠনের প্রচেষ্টার শুরু থেকে ১৯২৫ এ ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা সর্বক্ষেত্রে পূর্ব ভারতীয় যুবকদের উপস্থিতি বেশী চোখে পরে। পরবর্তীতে সমাজতান্ত্রিক দলের নেতৃত্ব, সাম্যবাদের ভাবধারা বিস্তারের উদ্যোগ, ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে এই অঞ্চলের মানুষের অবদান অনস্বীকার্য। সুতরাং স্বাধীনতা সংগ্রামে সাম্যবাদী আদর্শের প্রবেশ এই অঞ্চলের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

ভারত অতীত থেকে বর্তমান একটি জাতিভিত্তিক ও বর্ণ বিভক্ত সমাজ। এই দেশে পশ্চিমী কায়দায় শ্রমভিত্তিক-অর্থনৈতিক শ্রেণিসংগ্রাম অথবা বলা ভালো মার্ক্সীয় শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি বা আগামীতে এমন হওয়ার সম্ভাবনা এখনো লক্ষ্য করা যায়নি। ভারতের সাম্যবাদী-সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ভারতীয় প্রাতঃস্মরণীয় মনিষীবৃন্দ ও বৈপ্লবিক নেতৃত্বর লেখনী ও কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সমাজতান্ত্রিক-বৈপ্লবিক আন্দোলনের ধারা খুবই গতিশীল ও সক্রিয় ছিল। সুতরাং এই অধ্যায় নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা প্রয়োজন। আমরা যখন এই অধ্যায় পড়ি তখন দেখা যায় এই সমাজতান্ত্রিক-বৈপ্লবিক আন্দোলনের ধারা ও তার আদর্শের প্রবেশ নিয়ে সম্পূর্ণ স্পষ্ট আলোচনা নেই। এই ধারার প্রবেশের ক্ষেত্রে কারন হিসাবে ফরাসী বিপ্লব, পশ্চিমী সাম্যবাদের প্রবেশ, রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্য ইত্যাদী বেশী করে দৃষ্টিগোচর হয়। আমি এখানে ভারতীয় সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদী আদর্শের মূল ভিত্তি কি ছিল এবং তার বহিঃদেশীয় প্রভাব ব্যাখ্যা করবো। মর্মার্থ এই যে, পূর্ব ভারতীয় রাজনীতিতে তথা স্বাধীনতা সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক-বৈপ্লবিক আদর্শের প্রবেশের ক্ষেত্রে কী কী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কারণ ছিল তা সমান্তরালভাবে আলোচনা করা হবে। তবে বিশেষতঃ ভারতীয় সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ও প্রচারকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

পূর্ব ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্যবাদ-সমাজতন্ত্রের প্রবেশকাল

১৮৬৪ সালে (২৮শে সেপ্টেম্বর) কার্ল মার্ক্স ও এঙ্গেলস বিশ্বব্যাপী শ্রমিক সংগঠনগুলিকে এক করতে ও সাম্যবাদী চেতনা বিস্তারে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী 'প্রথম আন্তর্জাতিক' সংগঠনের গোড়াপত্তন করেন। ১৮৭১ সালের ১৭-২৩ সেপ্টেম্বর মার্ক্স ও এঙ্গেলসের নেতৃত্বে সাংগঠনিক অঙ্গ হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই বছর তৎকালীন কলিকাতার কিছু যুবকবৃন্দ মার্ক্সের সাথে যোগাযোগ করে যাতে ভারতের শ্রমজীবী সাম্যবাদী মানুষ 'প্রথম আন্তর্জাতিক' সংগঠনে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। কিন্তু শেষে সেই চেষ্টা সফল হয়নি। এর মধ্যে মার্ক্স অসুস্থ হয়ে পরলে ১৮৭৬ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন স্থিমিত হয়ে পরে ও অবলুপ্তি ঘটে।[১] 'প্রথম আন্তর্জাতিক' সংগঠনের সাথে কলিকাতার যুবকদের যোগাযোগের চেষ্টা প্রমান করে পূর্ব ভারতে মার্ক্সের প্রভাব ও সমাজতান্ত্রিক চেতনার পরোক্ষ অনুপ্রবেশ। পরবর্তীতে বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের কালপর্বে (১৯০৫-১৯১১ খ্রিঃ) বাংলা তথা পূর্ব ভারতীয় যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক-সাম্যবাদী ভাবধারার উপস্থিতি দেখা যায়।

বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) স্বদেশী আন্দোলনের কালপর্বে উঠে আসা একজন বিপ্লবী। তিনি প্রথম থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে চরমপন্থি, সমাজতান্ত্রিক চেতনার প্রচারক ছিলেন। নরমপন্থী জাতীয়তাবাদ, বা পরবর্তীতে জনপ্রিয় গান্ধীবাদের সাথে তার মতের কোনও মিল খুজে পাওয়া যায়নি। তিনি কোনও ভাবপন্থার 'ম্যাজিক-এ' বিশ্বাস করতেন না, তিনি চরমপন্থি বৈপ্লবিক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের 'লজিক-এ' আস্থাপ্রবন ছিলেন। বিপিনচন্দ্র পালের রাজনৈতিক চেতনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাদের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা ভারতীয় ধাঁচে গঠিত বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক ধারা। এর সাথে প্রত্যক্ষ মার্ক্সীয় সাম্যবাদের খুঁজে মিল পাওয়া যায় না, তবে এখানে পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। সমসাময়িক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী (১৮৬৯-১৯৩২) একই পথের অনুসারী ছিলেন। ঋষি অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) প্রত্যক্ষভাবে আধুনিক পুঁজিবাদের বিরোধী ছিলেন। তিনি তার রাজনৈতিক চেতনায় সামাজিক সাম্যের জয়গান করেছেন। জাতপাত ও সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে সকলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের জন্য সওয়াল করেন। এক্ষেত্রে তার রাজনৈতিক আদর্শে পশ্চিমি সমাজতন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আন্যান্য ভারতীয় এবং পশ্চিমী সমাজবাদী দার্শনিকদের মতো তিনিও 'হিতবাদ' দর্শনের বিরোধী ছিলেন। আরবিন্দ মনে করতেন হিতবাদে সার্বিক সামাজিক বিকাশের ধারনা নেই। এখানে সংখ্যালঘু জনগনের আধিকার লুণ্ঠিত হয়।[২] তিনি আধুনিক পুঁজিবাদ ও উপনিবেশবাদের ফলে সৃষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক বঞ্চনা, হতাশা, বিশৃঙ্খলা ও সংকটের অবসানের জন্য সাম্যবাদী চেতনার প্রচারে গুরুত্ব দিয়েছেন। যদিও তার আধ্যাত্মিক চেতনা এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মধ্য বিস্তর ফারাক। ঋষি আরবিন্দ রাজনৈতিক সন্যাস নেওয়ার পর অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব আরপ করতেন। এই অভিমত অনুসারে, অর্থনৈতিক যুক্তি, গণতান্ত্রিক প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে সাম্প্রদায়িক চিন্তা বিস্তার করানো হয়। অন্যদিকে তিনি বেদান্ত দর্শনের প্রচারক ছিলেন। বেদান্ত দর্শন থেকে তার প্রাপ্ত রাজনৈতিক চিন্তা হল, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার বিকাশ। এই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা তিনি মহাজাগতিক চেতনা উপলব্ধির মাধ্যমে অর্জন করতে বলেছেন। একথা বলা প্রয়োজন, আমরা জানি তিনি প্রথম জীবনে সমাজতান্ত্রিক চেতনা ও

চরমপন্থায় বিশ্বাসী হলেও পরবর্তী জীবনে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করে। সেখানেও তিনি আত্মিক স্বাধীনতা ও সামাজিক সাম্যের প্রতি জোর দিয়েছেন। তবে তার চিন্তায় বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের সাথে কোনও মিল নেই। তিনি কমিউনিস্ট অর্থনৈতিক মতবাদের সমালোচক ছিলেন । পশ্চিমের এই সাম্যবাদী অর্থনৈতিক মতবাদ কখনও মানবতাবাদের বিকাশ ঘটাতে পারে না বলে তিনি আলোকপাত করেছেন। অর্থনৈতিক মানবতাবাদ কখনও সার্বিক সাম্য ও সামাজিক-মানসিক বিকাশ আনতে পারে না।

অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩) তার প্রথম রাজনৈতিক জীবনে স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এবং পূর্ববঙ্গের বরিশালে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তী জীবনে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথমসারির নেতৃত্ব দেন। তিনি ঠাণ্ডাঘরে বসে রাজনীতির বিরোধী ছিলেন। জনগণের সাথে যুক্ত হয়ে মুক্ত আন্দোলনের পথনির্দেশ করেন। প্রমথনাথ মিত্র (১৮৫৩-১৯১০) সাম্যবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম পূজারী ছিলেন। তিনি ইংল্যান্ডে ওকালতি পড়ার সময় কার্ল মার্ক্সের শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে বিস্তর আনুসন্ধান করেন। পরবর্তীতে যখন রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীরা সাংগঠনিক কাজকর্ম শুরু করে তিনি তা পর্যবেক্ষণ করেন। ব্যারিস্টার হয়ে ভারতে এসে বিপ্লবী সংগঠনে যুক্ত হওয়ার পরিকল্পনামাফিক গুপ্তসমিতিতে যোগদান করেন। ১৯০২ সালে সতীশচন্দ্র বসুর সাথে যৌথ প্রয়াসে 'অনুশীলন সমিতি' গড়ে তোলেন।[৩] তিনি নিজে সংগঠনের অধিকর্তা নির্বাচিত হন। তিনি কোনওদিন জাতীয় কংগ্রেসের সাথে যুক্ত হননি এবং নরমপন্থি আন্দোলনের তীব্র বিরোধী ছিলেন। ১৯০৬ সালে 'নিখিল বঙ্গ বৈপ্লবিক সমিতি'র সভাপতি নির্বাচিত হন। একথা ঠিক অনুশীলন সমিতি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায় এর "অনুশীলন" ও 'চরমপন্থী' চিন্তাধারার ওপর গড়ে উঠেছিল কিন্তু তা একপ্রকার ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অন্যতম রূপদান। প্রমথনাথ মিত্র মহাশয়ের সাথে সাথে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী নেতা সতীশচন্দ্র বসুর(১৮৭৬-১৯৪৮) নামও উঠে আসে। স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে স্বশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শকে পাথেয় করে বিপ্লবী সতীশচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে অনুশীলন সমিতি। ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপের জন্য গোপনে 'কাশীনাথ সাহিত্য সমিতি' গড়ে তুলেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায় এর 'অনুশীলন তত্ত্বর' আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে সংগঠনটি গড়ে উঠেছিলো। সংগঠনের মাধ্যমে ব্রিটিশ বিরোধী কাজ চলাকালীন ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ড থেকে সদ্য প্রত্যাগত প্রমথনাথ মিত্রের তার সাথে পরিচয় হয়েছিলো। সতীশচন্দ্রের 'কাশীনাথ সাহিত্য সমিতি' এবং 'নিখিল বঙ্গ বৈপ্লবিক সমিতি'-র সমন্বয়ে ১৯০৩ সালে গুপ্ত বিপ্লবী দল 'অনুশীলন সমিতি' গঠন করেন বিপ্লবীরা।[৪] অশ্বিনী কুমার ব্যানার্জী ১৯০৬ সালের অগাস্ট মাসে বজবজে পাট কারখানার শ্রমিকদের সংগঠিত করে ব্রিটিশ বিরোধী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। শ্রমিক সংগঠনের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আসার বীজ বপন করে গিয়েছিলেন। বলা যায় ভারতে পরবর্তী কালের বামপন্থী আন্দোলনের একটা উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৮০-১৯৫৯) ওরফে বারীন ঘোষ, ঋষি অরবিন্দ ঘোষ ও যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রমুখ বিপ্লবী নেতৃত্বের সংস্পর্শ পেয়ে চরমপন্থী বৈপ্লবিক আদর্শে দীক্ষিত হন। ১৯০৩ সাল নাগাদ স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন এবং তাদের আন্দোলন ভারতবাসীর মধ্যে প্রচারের পরিকল্পনা করেন। এই প্রচারের মাধ্যমে হিসাবে ১৯০৬ সালে 'যুগান্তর' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা 'যুগান্তর দলের' মুখপত্র ছিল।[৫] যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আরেকজন খ্যাতনামা বিপ্লবী

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বসু, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, কিরণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র রায় প্রমুখ কলমচি এই পত্রিকার জন্য কলাম লেখা ও সম্পাদনা-প্রকাশনার তত্ত্বাবধান করতেন। বিপ্লবীদের অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে গোপন শিবির খুলেছিলেন এবং এর ফলে তিনি ব্রিটিশ সরকারের কুনজরে আসেন। ১৯০৮-০৯ সালের আলিপুর বোমা মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হন ও এই মামলার রায়ে তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে নিরালম্ব স্বামী (১৮৭৭-১৯৩০) ঋষি অরবিন্দের স্নেহভক্ত ছিলেন। ১৮৯৯ সালে তিনি অরবিন্দের সাহচর্যে আসেন এবং বিপ্লবী আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে মনোনিবেশ করেন। ইতালির ঐক্য আন্দোলন ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপ নিয়ে পড়াশুনো করতেন এবং এবিষয়ে প্রচুর কলাম লিখতেন। আলিপুর বোমা মামলার পর তিনি বৈপ্লবিক আন্দোলন এর প্রতি নিরাসক্ত হন।[৬] পরবর্তীতে ঋষি অরবিন্দর পথ অনুসরণ করে সন্ন্যাস নেন ও বাকি জীবন নিরালম্ব স্বামী নামে আধ্যাত্মিক জীবন অতিবাহিত করেন।

পূর্ব বাংলায় কেবলমাত্র সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে চরমপন্থি বিপ্লবী আন্দোলন অথবা যুবকরা শুধুমাত্র অস্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেনি, সাথে সাথে মানুষের মনে বিনোদনের সাহায্যে সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শ প্রচার করেছিলেন। এর ফলে যুব সমাজের সাথে বাংলার সর্বস্তরে সাম্যবাদের গান মুখরিত হয়েছে।এক্ষেত্রে 'চারণকবি' মুকুন্দ দাসের (১৮৭৮-১৯৩৪) নাম সর্বজনবিদিত। তিনি গান ও কাব্য রচনার মাধ্যমে বিপ্লববাদ ও চরমপন্থি রাজনৈতিক চেতনা প্রকাশ করেন। 'কান্তকবি' রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) তার স্বদেশপ্রেমের বানী গান ও সুরের সাধনায় প্রকাশ করেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের বিপ্লবী থেকে শুরু করে আপামোর বাংলার মানুষ তার রচিত গানে উজ্জীবিত হয়েছিল।

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই;
দীন দুখিনি মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই।"[৭]

পল্লী কবি রজনীকান্তের এই গান তাকে সারা ভারতবর্ষে পরিচিতি দেয়। গানটি এককথায় গন আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) তার নাট্য সাহিত্যর মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিলেন। তিনি কৃষক দরদী নাট্যকার এবং উচ্চবিত্তের প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব মুক্ত সমাজের গান গাইতেন। লন্ডনে পড়াশুনার পাশাপাশি সেখানে নাট্যমঞ্চের প্রতি আকৃষ্ট হন ও সেই মঞ্চের কলাকুশলীদের যে বামপন্থী আদর্শ কাজ করতো তা কবির মনে দারুন প্রভাব ফেলেছিল। ঐতিহাসিক কাব্য ও নাটকেও তার সেই সমাজচেতনার ছাপ ধরা পরে। এছাড়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪), সতীশচন্দ্র মুখার্জি, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী প্রমুখ ব্যাক্তিত্ব তাদের স্বকিয় গুনে ভারতের নিচুতলার মানুষদের মধ্য ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

ঋষি অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পালের সাথে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী অনুশীলন সমিতির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এছাড়া ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুলিন বিহারী দাস, সরলা দেবী, রাসবিহারী বসু, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, যতীন দাস ও বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ অনুশীলন সমিতির সদস্যদের মধ্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী চেতনা গড়ে উঠেছিল।[৮] এক্ষেত্রে বলা হয় স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেম ও বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জির 'অনুশীলন তত্ত্ব' ও 'আনন্দমঠ' উপন্যাস, এবং গীতার বাণীর প্রভাব অনুশীলন সমিতির আদর্শের ভিত্তি। তবে একথা ঠিক যে, পশ্চিমি

সমাজতন্ত্র ও বৈপ্লবিক চেতনার সাথে ভারতীয় সাম্যবাদী-সমাজতন্ত্রে মূলগত পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী ভাবধারা ও পরবর্তীতে গান্ধিবাদে যে রাজনৈতিক চেতনার কথা বলা হয়েছে, তার সাথে স্বদেশী-চরমপন্থী-বৈপ্লবিক-সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার কোনও সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু পশ্চিমি সমাজতন্ত্রের সাথে বহু মিল রয়েছে। আমরা দেখতে পারি সুভাষচন্দ্র বসু একই ভাবে ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন, যা চরমপন্থা ও বিপ্লববাদের সমার্থক। বাংলায় প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দল সর্বদাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনের পথপ্রদর্শক ছিল।

১৯০৫ সালে পূর্ব ভারতে তথা সারা বাংলায় যে বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলন গড়ে উঠেছিলো তা ব্রিটিশ বিরোধী চরমপন্থি আন্দোলন বা পরবর্তীতে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলো। এখানে 'সন্ত্রাস' বলতে সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসকদের মনে 'ত্রাস' সৃষ্টি করা। ভারতীয় যুবক-যুবতিরা তথা বিপ্লবীরা যেহেতু সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসকদের মনে 'ত্রাস' সৃষ্টি করেছিল, তাই এই আন্দোলনের ধারা ব্রিটিশ বিরোধী 'সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন'। যেহেতু এই ভারতীয় জাতীয় 'সন্ত্রাসবাদী' কার্যকলাপ ভারতীয় সার্বভৌমত্ব বিরোধী নয়, স্বাধীন ভারত গঠনের পক্ষে, সেহেতু এই 'সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী' তকমা ভারতীয়দের কাছে গর্বের ইতিহাস। সুতরাং এই 'সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী' শব্দচয়ন নিয়ে কোনও বিতর্ক থাকতে পারে না। এটি স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি পন্থা মাত্র। যাইহোক, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে 'সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন' সবচেয়ে বেশী কার্যকারী ছিল। কারন এই রক্তক্ষয়ী আন্দোলনকে ঠেকাতে ব্রিটিশ সরকারের কালঘাম ছুটে গিয়েছিল। ঠাণ্ডা ঘরে বসে কাগজ আদান প্রদানের রাজনীতিতে ব্রিটিশ শাসকদের শুধুমাত্র বৌদ্ধিক চর্চা করতে হয়েছিল এবং পাওনাগণ্ডার হিসেব পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছিল। অন্যদিকে 'সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন' এর ফলে ব্রিটিশরা আর্থসামাজিক ও মানসিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। এই আন্দোলনের সূত্রপাত স্বদেশীযুগ থেকেই এবং আদর্শগত ভাবে বিপ্লবীরা সমাজতান্ত্রিক। পূর্বেই আলোচনা করেছি, আবারও বলছি যে, ভারতের এই সমাজতান্ত্রিক-সাম্যবাদি চেতনার সাথে পশ্চিমি বামপন্থার ধারা হুবহু মেলে না। এখানে ভারতীয় নবগঠিত জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সাথে পশ্চিমি সাম্যবাদের মিশ্রন ঘটেছে মাত্র। একথাও আলোচ্য যে, মার্ক্সবাদী আন্দোলনের ধারা,সাম্যবাদের কার্যকারিতা,এর বাস্তবায়ন দেশ-কাল-সমাজ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। মার্ক্সবাদ ও সাম্যবাদের পশ্চিমী ধাঁচকে অন্ধ অনুসরন অবৈজ্ঞানিক। সুতরাং ভারতের জাতীয়তাবাদী ভাবনা ও সাম্যবাদের-সমাজতন্ত্রের অনুকরণে ও মিশ্রণে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকরী 'সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন' গড়ে উঠেছিল।

বিপ্লবী আন্দোলনে যে জাতীয়তাবাদী ধারার সৃষ্টি হয়েছিল তা বিবেকানন্দ-বঙ্কিম-অরবিন্দ অনুসরন করে গড়ে উঠেছিল এবং কিছু ক্ষেত্রে 'শ্রীমদভাগ্বতগীতা' বা গীতার বানী কার্যকরী ভূমিকা গ্রহন করেছিল। কিন্তু একথা ঠিক পশ্চিমী সমাজতান্ত্রিক ধারা-সাম্যবাদী চেতনা-ফরাসি বিপ্লব-রাশিয়ার বিপ্লবী কার্যকলাপ সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ তার ভারতীয় জনগণ বলতে দরিদ্র-নিপীড়িত-অবহেলিত-পশ্চাৎবর্গ মানুষের কথা সর্বদা আলোচনা করতেন। তার ভাবনায় এই অসহায় মানুষের মুক্তি হল প্রকৃত স্বাধীনতা প্রাপ্তি। আর এই মূল চিন্তা চেতনা নিয়েই গড়ে উঠেছিলো তার 'বর্তমান ভারত' এর জাতীয়তাবাদ।[৯] এক্ষেত্রে তিনি একজন প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক, একজন সাম্যবাদী

চেতনা নায়ক।এই ভারতীয় সমাজতন্ত্রী আদর্শ বৈপ্লবিক আন্দোলন সংগঠনে সহায়ক হয়েছিল। তার সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী চেতনার আদর্শ তুলে ধরতে কিছু বানী এখানে উল্লেখ করলাম-

"একই লোক চিরকাল সুখ বা দুঃখ ভোগ করবে, তার চেয়ে সুখদুঃখটা যাতে পর্যায়ক্রমে বিভক্ত হতে পারে, সেইটাই ভালো।" (স্বামী বিবেকানন্দ, পত্রাবলী পৃ- ৫০৯)

"শূদ্রযুগ আসবেই আসবে --এ কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না।" (স্বামী বিবেকানন্দ, পত্রাবলী পৃ- ৫০৯)

"হে ভারতের শ্রমজীবী! তোমার নীরব অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরাজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য। আর তুমি?- কে ভাবে এ-কথা". (স্বামী বিবেকানন্দের বানী ও রচনা, খণ্ড -৬, পৃ-৮৩)

".....অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য- সে তোমার ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী!- তোমাদের প্রণাম করি।" (স্বামী বিবেকানন্দের বানী ও রচনা, খণ্ড -৬, পৃঃ৮৩)

উপরিউক্ত কয়েকটি বাণী বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদ ও সাম্যবাদী আদর্শের নির্দিষ্ট উদাহরণ স্বরুপ গ্রহন করা যেতে পারে। তার সুখদুঃখের পর্যায়ক্রম বলতে হতদরিদ্র অবহেলিত ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর। তিনি মনে করতেন এটা সময়ের অন্তরালে বিবর্তিত হবে। প্রথম যুগ (বৈদিক যুগ) ছিল ব্রাহ্মন শাসিত, পরবর্তীতে ক্ষত্রিয় শাসিত সমাজের (খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের রাজতন্ত্রের উত্থান) উত্তরণ ঘটে; এরপর বৈশ্য শাসিত (পুঁজিবাদের উত্থান) সমাজ এল। তিনি ভবিষ্যতে শূদ্র জাগরণের কথা বলেছেন। এই শূদ্র জাগরন বলতে বোঝায় সর্বহারার শাসন প্রতিষ্ঠা। এখানে শূদ্র বলতে শুধুমাত্র জাতিভেদে বর্ণিত সর্বনিম্ন, অন্ত্যজ সমাজের উল্লেখ নয়, সাথে সাথে এই শূদ্র সমাজ হল- জাতি বিভাজনের ফলে সৃষ্ট অবহেলিত সর্বহারা মানুষ। বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে এই সর্বহারার শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ভারতবর্ষে চিরাচরিত কাল থেকে যে শ্রেণিবিভক্ত সমাজ বর্তমান তা জাতিভিত্তিক। কার্ল মার্ক্স তার ঐতিহাসিক বস্তুবাদে যে শ্রেণীর উদ্ভব ও শ্রেণী সংগ্রামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা ভারতে প্রযোজ্য নয়। জাতিভিত্তিক ভারতীয় সমাজে মূল চতুর্বর্ণ (ব্রাহ্মন,ক্ষত্রিয়,বৈশ্য ও শূদ্র) ও উপবর্ণের ভিত্তিতে সংগ্রামের ধারা ও দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করা যায়। এখানে শূদ্র জাতি ও উপজাতি, বনবাসী, অন্তজরা অবহেলিত তথা সর্বহারা। সুতরাং ভারতীয় সমাজে বিবেকানন্দ ও সমভাবাপন্ন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদদের পথনির্দেশ সর্বাপেক্ষা কার্যকরী। আমরা নিঃসন্দেহে দাবী করতে পারি যে ভারতীয় সমাজতন্ত্রের তথা সাম্যবাদের জনক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। পরবর্তীতে এই আদর্শগত ধারা অরবিন্দ থেকে শুরু করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সহ প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় বিপ্লবীর মধ্য অন্তর্নিহিত ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে যে চরিত্রগুলি নির্মাণ করেছিলেন তা কোনও উপরতলার মানুষের জীবন দর্শন নয়। সেখানে পূর্ব ভারতে দুর্ভিক্ষে সর্বহারা সমাজ, খাদ্যহীন-পেয়জলহীন, ভুখা কৃষক ও ব্রিটিশ-মহাজনী কারবারিদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ জনগণের চিত্র তুলে ধরেছেন।[১০] এই বঞ্চিত সমাজের কল্যানে কিভাবে ভারতের সন্ন্যাসীরা বিদ্রোহ করে ও আত্মবলিদান দিয়েছিলো সেই কাহিনী চরিত্র চিত্রণ করা হয়েছে। অন্যদিকে তার 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসেও প্রফুল্ল

ওরফে দেবী চৌধুরানী, ভবানী পাঠক চরিত্রগুলিকে দরিদ্র সর্বহারা মানুষের রক্ষাকর্তা হিসাবে তুলে ধরেছেন। ডাকাতদলের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ-মহাজন-জমিদার দের লুণ্ঠন করে দরিদ্র মানুষের সহায়তা করা। এই দুটো উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক চেতনার বিস্তার ঘটেছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, সমাজতান্ত্রিক চেতনা ও সর্বোপরি ঐক্য আন্দোলনের যে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ শুরু হয়েছিল তার জন্মদাতা ছিল পূর্ব ভারতের দুটি গুপ্ত সমিতি- অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দল। এই সংগঠন দুটি প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রবিন্দুতে স্বামী বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক চেতনার সাথে সাথে বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায় এর 'অনুশীলন তত্ত্বর' আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে সংগঠন দুটি গড়ে উঠেছিলো। যাইহোক, পূর্ব ভারতের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব উপরিউক্ত ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক-সাম্যবাদী চিন্তাধারা রাজনৈতিক কর্ম সম্পাদনের হাতিয়ার বানিয়েছিল এবং স্বাধীনতার মুক্তি সূর্যের আহ্বান করেছিলেন। শুধুমাত্র কেতাবী রাজনীতি ও ঠাণ্ডা ঘরে বসে কূটনৈতিক পত্রের লড়াই ভারতকে শৃঙ্খলমুক্ত করেনি। পূর্ব ভারতের অগ্নিযুগের জনপ্রিয় ব্রিটিশ বিরোধী সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের অনতিদীর্ঘ একটি তালিকা দেওয়া হল।

নাম	জীবনকাল	জনপ্রিয়তা
প্রমথনাথ মিত্র	১৮৫৩-১৯১০	অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
অশ্বিনীকুমার দত্ত	১৮৫৬-১৯২৩	অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
মাতঙ্গিনী হাজরা	১৮৭০-১৯৪২	ভারত ছাড়ো আন্দোলনের শহীদ
ঋষি অরবিন্দ ঘোষ	১৮৭২-১৯৫০	অনুশীলন সমিতির সদস্য ও আলিপুর বোমা মামলা
সতীশচন্দ্র বসু	১৮৭৬-১৯৪৮	অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি (বাঘা যতিন)	১৮৭৯-১৯১৫	অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত	১৮৮০-১৯৬১	যুগান্তর দলের সদস্য
অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি	১৮৮০-১৯৫৭	যুগান্তর দলের সদস্য
বারিন্দ্রকুমার ঘোষ	১৮৮০-১৯৫৯	আলিপুর বোমা মামলা
উল্লাসকর দত্ত	১৮৮৫-১৯৬৫	যুগান্তর দলের সদস্য
প্রফুল্ল চাকী	১৮৮৮-১৯০৮	ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা
ক্ষুদিরাম বসু	১৮৮৯-১৯০৮	ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা
অতুলকৃষ্ণ ঘোষ	১৮৯০-১৯৬৬	অনুশীলন সমিতির সদস্য
ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত	১৮৯২-১৯৭৯	অনুশীলন ও যুগান্তর দলের সদস্য
মাস্টারদা সূর্য সেন	১৮৯৪-১৯৩৪	চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন
গনেশ ঘোষ	১৯০০-১৯৯৪	চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

রাজেন্দ্র নাথ লাহিড়ী	১৯০১-১৯২৭	কাকোরি বিপ্লব
অনন্ত সিং	১৯০৩-১৯৭৯	চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন
যতীন্দ্র নাথ দাস	১৯০৪-১৯২৯	লাহোড় ষড়যন্ত্র মামলা, জেলে ৬৩ দিনের অনশন
বিনয় বসু	১৯০৮-১৯৩০	রাইটার্স ভবনে অলিন্দ যুদ্ধ
বটুকেস্বর দত্ত	১৯১০-১৯৬৫	১৯২৯ এ আইনসভায় বোমা নিক্ষেপ
প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার	১৯১১-১৯৩২	পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ
দীনেশ চন্দ্র গুপ্ত	১৯১১-১৯৩১	রাইটার্স ভবনে অলিন্দ যুদ্ধ
বীণা দাস	১৯১১-১৯৮৬	যুগান্তর দলের সদস্য
বাদল গুপ্ত	১৯১২-১৯৩০	রাইটার্স ভবনে অলিন্দ যুদ্ধ
কল্পনা দত্ত	১৯১৩-১৯৯৫	চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন
সুবোধ রায়	১৯১৫-২০০৬	চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

পূর্ব ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্যবাদী দল তথা কম্যুনিস্ট পার্টি অথবা পশ্চিমী অনুকরণে মার্ক্সবাদী দলের উদ্ভব জানতে আমাদের ১৯১৭ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত আবর্তিত ইতিহাস লক্ষ্য করতে হবে। দ্বিতীয় কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিক (১৮৮৯-১৯১৬); ১৯১৭ সালের রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব সফল হওয়া; এবং তৃতীয় কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিক (১৯১৯-১৯৪৩) বা কমিনটার্ন এর মঞ্চ ভারতের মার্ক্সবাদী-সাম্যবাদী দল গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। এক্ষেত্রে প্রথমেই যার নাম করতে হয়, তিনি সাম্যবাদী বিপ্লবী নেতা বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৮০-১৯৩৭)। আই সি এস পরীক্ষা ও পড়াশুনার জন্য ব্রিটেনে গিয়ে তিনি বিপ্লবী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসকের কুনজরে পরে প্যারিসে পালিয়ে যান এবং ফরাসী সোশ্যালিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন। ১৯১৬ সাল অবধি বার্লিনে,ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থে বার্লিন কমিটি পরিচালনা করেছিলেন। বিপ্লবী দল গঠনের উদ্দেশ্যে সেখান থেকে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর সাথে সঙ্গী হয়ে ইস্তানবুল, কাবুল ও তুর্কি ভ্রমন করেছিলেন। শেষে ১৯১৮ সালে কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিক এর সম্পাদক রুশ নেতা Troinovski এবং রুশ-ইতালীয় নেত্রী Angelica Balabanova র সাথে দেখা করেন। এর ফলে তার রুশ কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগাযোগ করার পথ খুলে যায়। তিনি লেনিনকে একটি টেলিগ্রাম পাঠান এবং লেনিন এর সন্তোষজনক উত্তর দেন।[১১] এর মধ্যে তার সাথে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের (১৮৮৭-১৯৫৪) আন্তরিকতা গড়ে ওঠে। তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায়কে আর্থিক ও রাজনৈতিক ভাবে সাহায্য করেন। তবে এক্ষেত্রে একটি অন্য তত্ত্ব রয়েছে যে, ভারতের দুজন মুহাজির মুসলিম (স্থানান্তরিত মুসলিম সম্প্রদায়), দুই ভাই জাব্বর খাইরি ও সাত্তার খাইরি ১৯১৮ সালে রুশ কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকে যোগদান করে ও লেনিনের সাথে বিস্তর আলোচনা করে যাতে তারা ভারতে একটি কম্যুনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তারা আবার খিলাফত আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। গান্ধীজী যখন খিলাফত আন্দোলনকে ১৯২০ তে অসহযোগ আন্দোলনে মিশিয়ে দেয়, তখন তারা এর সমর্থন করেছিল। বলা হয় এই ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্যান্য মুহাজির-খিলাফতি দের সমর্থন

তাসখন্দে কম্যুনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ছিল।[১২] যাইহোক, ১৯২০ সাল নাগাদ অবনীনাথ মুখার্জি (১৮৯১-১৯৩৭) ও মানবেন্দ্রনাথ রায় দ্বিতীয় কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকে যোগ দেন এবং সেখানে তারা ইন্ডিয়ান কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো রচনা করেছিলেন। এরপর ১৭ই অক্টোবর ১৯২০ সালে তাসখন্দে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই পার্টির ভারতের মাটিতে সক্রিয় হতে অনেক সময় নেয়। এর মধ্য তৃতীয় আন্তর্জাতিকে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে লেনিন এর সাথে এম এন রায় এর ভাবগত বিরোধ বাঁধে। ১৯২৪ এ তৃতীয় আন্তর্জাতিক এ যোগ দিতে এম এন রায় চিনে যান। কিন্তু সেখানেও রুশ কমিনটার্ন নেতা মিখাইল মারকভিচ বোরোদিন এর সাথেও বিরোধ বাঁধে। ফলে তিনি চিন থেকে বিতাড়িত হন এবং কমিনটার্ন থেকে বহিষ্কৃত হন। লেনিন ও পরে বোরোদিন এর সাথে এম এন রায় এর বিরোধের কারন হল, রাশিয়া চেয়েছিল ভারতে প্রথমে 'বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব' সংগঠিত হোক। কিন্তু এম এন রায় এর মতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এতে সামিল হলে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এতে প্রভাব বিস্তার করবে। তিনি ভারতে একটি প্রকৃত 'সমাজতান্ত্রিক-সাম্যবাদী বিপ্লবের' পরিকল্পনা করেছিলেন। লেনিনের কাছে তথ্য ছিল যে, ১৯২০ এ কম্যুনিস্ট পার্টি গঠনে খিলাফতি দের ভূমিকা ছিল এবং খিলাফতিরা কংগ্রেসের সাথে যৌথ ভাবে আন্দোলন করছে।সুতরাং লেনিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির লক্ষ্য হবে প্রথমে জাতীয় কংগ্রেসের সাথে সামিল হয়ে যৌথ ভাবে একটি 'বুর্জোয়া-গনতান্ত্রিক বিপ্লব' সংগঠিত করা । যা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করবে। পরবর্তীতে স্বাধীন ভারত 'সমাজতান্ত্রিক-সাম্যবাদী বিপ্লবের' দিকে মনোনিবেশ করবে। কিন্তু এম এন রায় এই পরিকল্পনার সাথে সহমত পোষণ করেনি। তিনি এক সার্বিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলেন।এক্ষেত্রে বলা ভালো এম এন রায় একজন দক্ষ মার্ক্সবাদী-সমাজতত্ত্বের পণ্ডিত ছিলেন। তাই ভারতের এই কম্যুনিস্ট আন্দোলন নিয়ে তার সাথে রুশ নেতাদের আদর্শগত বিরোধ বাঁধে। আমরা দেখি লেনিন এর মৃত্যুর পরও রুশ কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব ভারত সম্পর্কে একই চিন্তাধারা অনুসরণ করেছেন। যার ফলে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সাথে তাদের সুদৃঢ় বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনে সুবিধা হয়েছিল। আমরা জানি নেহেরু ফেবিয়ান সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। ফলে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অনুসারী ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ও রুশ কম্যুনিস্টদের পারস্পারিক রাজনৈতিক সম্পর্ক চমকপ্রদ ছিল। তুলনামূলকভাবে ভারতের তৎকালীন কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে রুশ কম্যুনিস্ট নেতৃত্বের এতটা গভীর সম্পর্ক ছিল না। যাইহোক এক্ষেত্রে অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কারণ বর্তমান রয়েছে, তবে স্বাধীনতাপূর্ব সময় থেকে ভারত-রুশ সুদৃঢ় রাজনৈতিক সম্পর্কের শুরু হয়েছিল।

১৯২০ থেকে ১৯২৫ অবধি কম্যুনিস্ট পার্টি ভারতে কোনও উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায়নি। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় কম্যুনিস্ট সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলো। অন্যদিকে পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২২-১৯২৭), মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯), কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৪), এই তিনটি মামলার ফলে সংগঠন ক্ষতিগ্রস্থ হয়।[১৩] অনেক ঘনঘটার মধ্যে ১৯২৫ এর ২৬ সে ডিসেম্বর এম এন রায়, অবনীনাথ মুখার্জি, এম পি টি আচার্য, এস ভি ঘাটে প্রমুখ প্রথম সারির নেতৃত্বে, ভারতের মাটিতে, কানপুরে প্রথম কম্যুনিস্ট পার্টির সম্মেলন বসে। কম্যুনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব ভারতীয় রাজনীতিতে

ও জাতীয়তাবাদী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভাবে এর প্রভাব বিস্তার ঘটে। ১৯২৬ সালে এম এন রায় ও অন্যান্য কম্যুনিস্ট নেতৃত্বের সহযোগিতায় কলিকাতায় শ্রমিক-কৃষক দলের একটি শাখা (Workers and Peasants party-WPP) গঠন করা হয়। যা আদতে জাতীয় কংগ্রেসের শ্রমিক স্বরাজ্য দল বা কীর্তি কিষান দলের বঙ্গ শাখা রূপে জানা যেত। কিন্তু পূর্ব ভারতের তথা বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের এই শ্রমিক কৃষক দলের নিয়ন্ত্রণ কম্যুনিস্ট দের হাতে চলে গিয়েছিলো। আবার ১৯৩৪ সালের মে মাসে পাটনায় জয়প্রকাশ নারায়ণ, মীনু মাসানী প্রমুখের উদ্যোগে পাটনা কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি গঠন করা হয়।[১৪] পরবর্তীতে আচার্য নরেন্দ্র দেব, ইউসুফ মেহের আলি, বসাবন সিংহ, প্রমুখ এই দলে যোগ দিয়ে একে সর্বভারতীয় কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির রূপ দেন। এই সমাজতান্ত্রিক নেতৃত্বরা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ কে বিশ্বাস করতেন। তবে সাংসদীয় গনতন্ত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে ফেবিয়ান সোশ্যালিজম কে পাথেয় করেছিলেন। অর্থাৎ ব্রিটিশ সোশ্যালিস্টদের মতো 'গণতান্ত্রিক-সমাজতন্ত্রে' আস্থা রাখতেন।

উপসংহার

অনতিদীর্ঘ এই আলোচনার শেষলগ্নে এসে বলি যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ব ভারতের (অবিভক্ত বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা) জনগণের অবদান অনস্বীকার্য। এই ক্ষেত্রে সাম্যবাদ-সমাজতন্ত্র ও বৈপ্লবিক আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে বহু যুবক-যুবতি আত্মবলিদান দিয়েছেন। সব বীর-বীরাঙ্গনা দের কথা সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আলোকপাত করা সম্ভব নয়। তবে আমার লেখনীর শিরোনাম অনুযায়ী পূর্ব ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনে সাম্যবাদী-সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রবেশ ১৮৭১ থেকে ১৯৩৪ এর মধ্যে ব্যাপক ও বিভিন্নভাবে প্রবেশ করেছিলো। এরপর ছিল তাদের অন্তিম স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কাল। এখানে আরেকটি প্রসঙ্গ তুলে ধরি যে, স্বরাজ্য দলের নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫) অনুশীলন সমিতির কর্মকাণ্ডের সময় থেকেই আরেকজন স্বনামধন্য অনুশীলন নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সাথে তার সখ্য গড়ে উঠেছিলো। তখন থেকেই তিনি তার সমাজতান্ত্রিক-সাম্যবাদী ভাবধারার সাথে একাত্ব হন। আর এই সমাজতান্ত্রিক আদর্শই তার পরবর্তী প্রজন্মের ভাবশিষ্য নেতাজী সুভাসচন্দ্রের মনমধ্য বিচরণ করেছিল।

তথ্য সূত্র নির্দেশিকা

১. M. V. S. Koteswara Rao, Communist Parties and United Front-Experience in Kerala and West Bengal. Hyderabad: Prajashakti Book House, 2003, p- 82.

২. K. Kishore, The Life and Times of Sri Aurobindo Ghosh. New Delhi: Prabhat Prakashan, 2016, p- 78.

৩. শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি, প্রথম সং., কলকাতা: ক্রান্তি প্রেস, ১৯৭৭, পৃ- ১১৩।

৪. তদেব, পৃ- ৯৬।

৫. A.K. Ray, Revolutionary Parties of Bengal: Dacca Anushilan, New violence and Jugantar, 1919-1930. Kolkata: Papyrus, 2013 p-112.

৬. Ibid, p-209.

৭. বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, রজনীকান্ত কাব্যগুচ্ছ, প্রথম সং, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০০০, পৃ- ৩৯।

৮. A. K. Ray, op. cit, p-207.

৯. স্বামী শুদ্ধানন্দ, বর্ত্তমান ভারতঃ স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম সং, কলিকাতা: কালিকা যন্ত্রে, ১৩১২, পৃ-৪৫-৫৫।

১০. শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমঠঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রথম সং, কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৪৫।

১১. G. Adhikari, Documents of the History of the Communist Party of India, vol 1, 1917-1922. New Delhi: People's Publishing House, 1971, p- 87.

১২. Ibid, p-94.

১৩. Ibid, p-232.

১৪. J. Narayen, Socialist Unity and The Congress Socialist party. Bombay: Congress Socialist Party, 1941 p- 2.

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাঙালি নারী

তনুজা খাতুন
সহকারী অধ্যাপিকা
ইতিহাস বিভাগ
রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ

বিংশ শতকের শুরু থেকে বাঙালি মেয়েরা জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের বিভিন্ন ধারায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সমান্তরাল দুটি ধারা-অহিংস আন্দোলন ও সহিংস বিপ্লবী আন্দোলন- দুটোই মেয়েদের আকর্ষণ করেছিল। বঙ্গভঙ্গের সময় বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও বয়কট থেকে শুরু করে স্বদেশি দ্রব্য গ্রহণের আন্দোলনে তারা সামিল হয়। গান্ধিজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা সক্রিয় আন্দোলনে প্রবেশ করে, অসহযোগ, আইন অমান্য, ভারত ছাড়ো আন্দোলনে তারা যুক্ত হয়ে পড়ে। সময়ের সাথে সাথে সক্রিয় বিপ্লবাত্মক আন্দোলনেও তারা উল্লেখ্য ভূমিকা রাখেন। এমন কি কমিউনিস্ট আন্দোলন ও তেভাগা আন্দোলনেও তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আলোচনা প্রসঙ্গতাই এইসব বাঙালি নারীর উল্লেখ ছাড়া অসম্পূর্ণ।

শব্দ সূচক: জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, বাঙালি নারী, অহিংস আন্দোলন, বিপ্লবাত্মক আন্দোলন, স্বাধীনতা।

গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাঙালি নারী বিষয়ক গবেষণা কর্মটির উদ্দেশ্য হল কিভাবে বাঙালী নারী সমাজ দীর্ঘদিনের অবরোধ প্রথার অচলায়তন ভেঙ্গে রাজনীতিতে সচেতন হয়ে ভারতের জাতীয় আন্দলনে নিজেদেরকে যুক্ত করে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিশ্লেষণ করা। বাঙালি নারীর সচেতন ভাবে রাজনীতিতে যুক্ত হওয়া এবং তাদের অগ্রযাত্রার স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করা। তাছাড়া ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাঙালিনারীর বহুমাত্রিক অংশগ্রহণের তথ্যও প্রকাশ করা। আসলে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাঙালি নারী এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে এসেছে , বস্তুত তার উল্লেখ না থাকলে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। তাই আমার আলোচ্য প্রবন্ধে ইতিহাসের সেই অধ্যায়কে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

ভূমিকা

পর্দা ভেঙ্গে বহির্জগতে বাঙালি মেয়েদের পা রাখা সীমিত ভাবে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। স্কুলে যেতে তারা শুরু করেছিল বন্ধ গাড়ি চড়ে। পরবর্তী দশক গুলিতে কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা ও তাদের জন্য খুলেছিল। মেয়েরা প্রবেশ করতে

শুরু করেছিল কর্মক্ষেত্রে মূলত শিক্ষয়িত্রী বা ডাক্তার হিসাবে। তবে ঘর সংসারই প্রকৃত পক্ষে মেয়েদের সার্থকতার ক্ষেত্র – এ বক্তব্য বিভিন্ন প্রবন্ধ, উপদেশ ধর্মী পত্রপত্রিকায় বারবার উচ্চারিত হয়েছিল। উদারপন্থী সংস্কারকরাও মনে করতেন স্ত্রী শিক্ষার উদ্দেশ্য হল সুমাতা, সুপত্নী, সুগৃহিণী হিসাবে মেয়েদের ভূমিকাকে আরও জোরদার করা। নারীর আর্থিক স্বনির্ভরতা কক্ষনোই কাঙ্ক্ষিত ছিল না। আর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মেয়েদের অংশ গ্রহণ ছিল অভাবনীয়। শুরুতে মেয়েরা তার পিতা, স্বামী বা পরিবারের সদস্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের অধিবেশনে যেত। যেখানে অনেক সময় গান গাওয়া ছাড়া তাদের আর কোন ভূমিকা ছিল না। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তারাও জাতীয়তাবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন। তারাও অংশ নেন ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে। অহিংস আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনেও তারা সমান ভাবে সামিল হন।

মূল আলোচনা

উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য নানা ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট রুপে ধরা পড়েছে। শিক্ষার প্রসারের ফলে ভারতীয় নারীকে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে এগিয়ে আসতে দেখা যায় না, উপরন্তু ভারতীয়রা নারীর ঘরোয়া রূপটিকে এক নতুন মোড়কে সমাজে তুলে ধরছিল। নারীদের এই সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটে। জাতীয় কল্পনায় নারী স্থান পায় ঘরোয়া ক্ষেত্রে এবং নারী চরিত্রের আসল রুপ লালন কর্ত্রী এবং রক্ষয়িত্রী। অধ্যাপক Partha Chatterjee তাঁর 'The Nation and its Fragement' নামক গ্রন্থে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ভারতীয় নারীর সংযোগ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটি বিশেষ তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ধারণার সাথে নারীর দুটি রূপ জড়িত ছিল – একটি বাস্তববাদী রূপ এবং অন্যটি আধ্যাত্মিক।[১] জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে উপনিবেশিক রাষ্ট্রের বহির্জগতে ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সেখানে নারীর থেকে পুরুষের প্রাধান্য অন্যদিকে তাদের জাতীয়তাবাদের গৃহ ছিল সার্বভৌমত্বের অন্দরমহল যেখানে তারা নারীর ভারতীয় সত্তাকে সযত্নে লালন করত। জাতীয়তাবাদীরা কিন্তু এই দোলাচল নীতিকে দীর্ঘদিন মেনেই চলেছিল এবং নারী সমস্যা সমাধানে সেভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের মধ্যেও যে দুটি বিষয় দীর্ঘদিন ধরে কম গুরুত্ব পেয়েছিল, সে দুটি ছিল – অস্পৃশ্যতার প্রশ্ন এবং নারী সমস্যা।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ঘরে এবং বাইরের যে টানাপোড়েন তা সুন্দর চিত্র ধরা পড়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরেবাইরে' উপন্যাসে। তার আগেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনায় 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে জাতীয়তাবাদী ও নারী নিয়ে একটি নতুন ধারণার সৃষ্টি করে। ইউরোপীয়রা দেশকে পিতৃভূমি হিসাবে কল্পনা করত। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা দেশকে ভাবতে শুরু করেন মাতৃভূমি রূপে যখন ১৯৭৫ সালে প্রসিদ্ধ বাঙালী বুদ্ধিজীবি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বন্দেমাতরম' গান রচনা করেন। এই গানটি পরে তিনি তার উপন্যাস 'আনন্দমঠ' (১৮৮২)-এর অন্তর্ভুক্ত করে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন।[২] বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের ধারণায় 'মাতৃকল্পনা' স্থায়ী আসন করে নেয়। বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের অন্যতম জনক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ মানুষকে

সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করতে মাতৃকল্পনাকে বিশেষ ভাবে ব্যবহার করেন। স্বদেশি আন্দোলনের সময় জাতীয়তাবাদীদের মনে নারী নিয়ে দুটি ধারণার সৃষ্টি হয়। বিপ্লববাদে বিশ্বাসীরা দুর্গা বা কালীকে শত্রুর বিনাশিনী রূপে কল্পনা করতে থাকেন। তেমনি অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতমাতা' চিত্র মায়ের নতুন মূর্তিকে প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে মাতৃদেবী অনেক বেশি ধীর,'শান্ত, অভয়, সমৃদ্ধি প্রদান কারিণী ; এই মূর্তি ছিল একাধারে মানবী ও দৈবী', একাধারে পরিচিত ও অতি প্রাকৃত।[৩] বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে স্নেহময়ী বাঙালি মায়ের ধারণার সঙ্গে নারী শক্তির এক অতি প্রাকৃত ধারণাও গড়ে উঠতে থাকে। গবেষিকা যশোধরা বাগচি অবশ্য এই ধরনের নারী কল্পনাকে সমালোচনায় করেছেন। তার মতে নারী সম্পর্কে জাতীয়তাবাদীরা কল্পকাহিনী সৃষ্টি করে নারীর প্রকৃত শক্তিকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে পরোক্ষ ভাবে বাধারই সৃষ্টি করেন।[৪]

বস্তুত, স্বাদেশী আন্দলনে নারীদের অংশ গ্রহণ যতটুকু থাক না কেন, তাদের সেই ভুমিকা সর্বজন গ্রাহ্য লিঙ্গ ভাবাদর্শের দ্বারাই সীমিত ছিল, যেখানে গৃহস্থালির কাজকর্মেই নারীর প্রকৃত অধিকার নির্দিষ্ট হত। তারা ব্রিটিশ দ্রব্য পরিহার করে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করত, কাঁচের চুড়ি ভেঙ্গে ফেলে, অরন্ধন দিবস পালন করে প্রতিবাদী আচরণ করত। এ সময় কাজী নজরুল ইসলামের 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা' গানের আহ্বানেও নারী সমাজ জেগে ওঠেন। এ প্রসঙ্গে কবি মুকুন্দ দাস গেয়েছেন -

'ও আমার বঙ্গনারী
পরো না বিলেতী শাড়ী
ভেঙ্গে ফেলো বেলোয়ারী চুড়ি' [৫]

এ সব কর্মসূচির মধ্যেই 'এক অন্দরমহল চিত্র' ধরা পড়ে। নারীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের দৃষ্টান্তও আছে। যেমন স্বর্ণকুমারীর কন্যা, রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলাদেবী চৌধুরানী। তিনি ভারতী পত্রিকার (প্রকাশকাল ১৮৯৫) মাধ্যমে নানা প্রবন্ধ প্রকাশ করে নারীর একটি শক্তি রূপকে তুলে ধরেছিলেন। মেয়েদের শরীরচর্চার উদ্দেশ্যে তিনি নিজের বাড়িতেই স্থাপন করেছিলেন ব্যায়ামাগার। সরলাদেবী 'বীরাস্টমী ব্রত' (১৯০৪) চালু করে বাঙালী জাতিকে শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। স্বদেশি পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয়দান, গোপনে অস্ত্র পাচার বা অস্ত্র লুকিয়ে রাখা, গোপনে সংবাদ আদান-প্রদান ইত্যাদি কাজে বিপ্লবীরা মেয়েদের সাহায্য নিত। এই সব উদাহরণকে কখনোই সর্বভারতীয় নারী সমাজে একমাত্র চিত্র বলে তুলে ধরা যায় না।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় প্রকাশ্যে সভা সমিতিতে নারীর যোগদানের উদাহরণ ছিল খুব কম। মূলত কারোর বাড়িতে বা পাড়ায় নারীরা সমবেত হতেন। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দীতে রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ভবনে যেমন নারীরা সমবেত হয়ে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' শুনেছিলেন, তেমনি অরন্ধন পালনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন। বাংলার শহর থেকে গ্রামাঞ্চলের নানা স্থানে বাংলার নারীরা পুরুষদের সঙ্গে সমবেত ভাবে। স্বাদেশি ব্রত পালনে এগিয়ে এসেছিল। এই প্রসঙ্গে কুমুদিনী মিত্র, লীলাবতী মিত্র, নির্মলা সরকার, হেমাঙ্গিনী দাস প্রমুখের নাম উল্লেখ্য। মূলত এই সব জাতীয়তাবাদীদের প্রচেষ্টায় পল্লীতে পল্লীতে চরকার প্রবর্তন, অর্থসংগ্রহ (লক্ষ্মীভাণ্ডার) ইত্যাদি কাজ সংঘটিত হয়। নারীদের সমর্থ আদায়ের জন্য স্বদেশি আন্দোলনের সময় সমৃদ্ধির দেবীলক্ষ্মীকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। প্রচার হয়

বঙ্গভঙ্গের জন্য 'মা লক্ষ্মী' দেশ ছেড়ে চলে গেছেন, তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে , রক্ষা করতে হবে। বাংলার প্রায় প্রতিটি নারীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় 'মায়ের কৌটো'। যেখানে নারীরা প্রতিদিন জন্মভুমির উদ্দেশ্যে এক মুঠ চাল ধরে রাখবে। যে সব নারীরা স্বদেশি আন্দলনের জন্য প্রচুর দান করতো তাদের 'বঙ্গলক্ষ্মী' উপাধিতে ভূষিত করা হত।[৬] এ সবই হত স্বদেশি আন্দোলনে মেয়েদের যোগদানে উৎসাহিত করার জন্য। কিন্তু এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ছিল মূলত বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তদের দ্বারা পরিচালিত। অতএব শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালী নারীরাই এই আন্দোলনে কিছুটা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

নিম্নবর্গের হিন্দু অথবা মুসলমান নারীদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার কোন উল্লেখযোগ্য উদাহরণ নেই।[৭] স্বদেশী আন্দোলনে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ অনেকটা কমছিল। মুসলিম মেয়েরা এ সময় শিক্ষায় যেমন পিছিয়েছিলেন, তেমনি রাজনৈতিক ভাবে তারা খুব একটা সচেতন ছিলেন না। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ভুমিকা পালন করেন পূর্ববাংলার খায়রুন্নেসা খাতুন (১৮৮৩-১৯১২)। উল্লেখ্য বঙ্গভঙ্গের আগেই ১৯০৫ সালে নব নূর পত্রিকায় 'স্বদেশানুরাগ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন 'আমরা নির্বোধ না হইলে সাত সমুদ্র পার হইতে বণিকগণ আমাদিগকে সামান্য জার্মান সিলভারের গহনা ও বেলোয়ারী চুড়ি দ্বারা প্রতারিত করিয়া জাহাজ ভরিয়া ভারতের ধন ও ধান্য লইয়া যাইতেছে।[৮]

স্বদেশি আন্দোলন থেকে উদ্ভূত চরমপন্থি বিপ্লববাদে যে সব নারীর নাম বিশেষ উল্লেখ্য তারা হলেন ভগিনী নিবেদিতা, সৌদামিনী দেবী (ফরিদপুর), সরোজিনী দেবী (বরিশাল), ব্রহ্মাময়ী সেন (ঢাকা), দু'কড়িবালা দেবী (বীরভুম) প্রমূখ। বিপ্লববাদের সঙ্গে বাংলার মেয়েদের যে গোপন যোগাযোগ সেটি ঔপনিবেশিকদের বিশেষ ভাবে মাথা ব্যথার কারণ ছিল। তাই তো রাশিয়ার নিহিলিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে বাংলার মেয়েদের স্বদেশি আন্দোলনে যোগদানকে তুলনা করাহয়। ১৯১০ সালে এলাহাবাদের কংগ্রেস অধিবেশন চলাকালীন সরলাদেবী চৌধুরানি (পাঞ্জাব প্রকাশনী) প্রতিষ্ঠা করেন 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল'। এই মহিলা প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সেবা বিষয়ে মেয়েদের অনুপ্রাণিত করা। এই মহিলা সমিতিতে বঙ্গীয় শাখার সম্পাদিকা নিযুক্ত হন ভামিনী দাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে দুইজন নেত্রীর উত্থান লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে সরোজিনী নাইডু কংগ্রেস অধিবেশন গুলোতে ভাষণ দিয়ে আসছিলেন এবং মূলত তাঁরই প্রস্তাব অনুসারে (১৯১৮) কংগ্রেস দল নারী পুরুষ সকলের জন্য ভোটাধিকারের দাবি জানায়। অপর এক নেত্রী এ্যানি বেসান্ত হোমরুল লিগ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে জাতীয় আন্দোলনে বিশেষ স্থান করে নেন। মাদাম কামার জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপ বহু ভারতীয় নারীকেও অনুপ্রাণিত করেছিল।

প্রকৃতপক্ষে মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের সময় (১৯২০-২২) থেকেই ভারতীয় রাজনীতিতে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণের সূচনা হয়। সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং গঠনমূলক কার্যক্রমে নারীরাও ব্যাপক অংশগ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। ১৯২০-৪০ এর মধ্যে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিতে এবং গান্ধিজির নেতৃত্বে সর্বপ্রথম ধর্ম, জাতি, বর্ণ ও শ্রেণী নির্বিশেষে সমস্ত স্তরের অসংখ্য নারীর রাজনৈতিক জাগরণ ঘটে। গান্ধিজি তার অহিংস আন্দোলনের সাথে এদেশের শিক্ষা, সামাজিক ও

অর্থনৈতিক সংস্কার বিষয়ে নিজের ভাবাদর্শকে যুক্ত করার ফলে অসংখ্য সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মহিলারা অসহযোগ আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সামিল হন। এ সময় সারা দেশে মহিলারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে দলে দলে বিদেশি কাপড় বর্জন, স্বদেশি প্রচার, মিছিল, মিটিং, পিকেটিং ইত্যাদি কার্যক্রমে যোগদান করেছেন। গঠনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদেশি কাপড় বর্জনের নেশায় ঘরে ঘরে নারীরা নিজের হাতে সুতো কেটে, চরকায় কাপড় বুনে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তাছাড়া গান্ধিজির ভাবাদর্শ অনুযায়ী গ্রামীণ শিল্পের উন্নতি, স্ত্রীশিক্ষা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি নারী পুরুষের সমতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এই অর্থে গান্ধিজির কালেই এদেশে ধনী-দরিদ্র, জাতি-বর্ণ, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব নারীর মধ্যে এক রাজনৈতিক জাগরণ ঘটে।

বাংলায় চিত্তরঞ্জন দাশের বোন ঊর্মিলা দেবীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'নারী কর্ম মন্দির' (১৯২১)। ১৯২২ সালে স্টিমার ধর্মঘট নিয়ে নেলী সেনগুপ্তর নেতৃত্বে গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯২২ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলনে বাসন্তী দেবী (চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী) সভাপতিত্ব করেন। জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য মেয়েদের প্রস্তুতি হিসাবে লীলা নাগ ১৯২৩ এ ঢাকায় গড়ে তোলেন 'দীপালি সংঘ'। মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রসার, সাহস ও শক্তি বাড়াতে লাঠি খেলা, শরীরচর্চা ও অসি চালনার ব্যবস্থা করে এই সংঘ। সংঘের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশ প্রেমের ভিত্তিতে নারীদের মধ্যে আত্ম সচেতনার উদ্বোধন। পুরুষের সাথে নারীরাও যাতে এগিয়ে আসতে পারে সে বিষয়ে 'দীপালি সংঘ' নানা কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। এই দীপালি সংঘের অন্যতম সভ্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দার ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে উল্লেখ্য নারী ব্যাক্তিত্ব। ১৯২৪ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর অনুপ্রেরণায় অক্সফোর্ড-এর শিক্ষিকা লতিকা ঘোষ গড়ে তুলেছিলেন 'মহিলা রাষ্ট্রীয় স্ত্রী সংঘ', এর সভাপতিত্ব করেন সুভাষচন্দ্র বসুর মা প্রভাবতী বসু। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল স্বরাজ অর্জন ও মহিলাদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো। ১৯২৮ সালে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে এক স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন করা হয়। যা সামরিক কায়দায় পরিচালিত হত। আবার ১৯২৯ এ ঊর্মিলা দেবীর নেতৃত্বে জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, শান্তি দেবী প্রমুখরা গড়ে তুলেছিলেন 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'। এরা কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় যেমন বড়বাজারে পিকেটিং করতেন, বিদেশি পণ্য বিক্রয়ে বাধা দিতেন এবং খদ্দরের পোশাক বিক্রি করতেন। এসবের মাধ্যমে মধ্য ও নিম্নবিত্তের নারীরা সংঘবদ্ধ হয়েছেন ভারতের জাতীয় আন্দোলনে।

বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষত মেদিনীপুরে মাতঙ্গিনী হাজরা, বীরভূমে সত্যবালা দেবী, ঢাকায় আশালতা সেন, বাঁকুড়ার সুষমা পালিত, কুমিল্লায় লাবন্য লতা চন্দ নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। এ সময় ভারতে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়। বাংলার শিক্ষিত মহিলারা বিপ্লবী দলে যোগ দেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে বিপ্লবী সূর্যসেনের সহকারিণী ছিলেন প্রীতিলতা ওয়েদ্দার, কল্পনা দত্ত ও সুহাসিনী গাঙ্গুলি। অপরদিকে শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, বীণা দাস প্রভৃতি মহিলারা বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। বিংশ শতকের চারের দশক থেকে মহিলাদের জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষত ভারতছাড়ো আন্দোলনে সুচেতা কৃপালনী যেমন অহিংস আন্দোলনকে সংগঠিত করেছিলেন তেমনি অরুণা আসফ আলি বৈপ্লবিক কাজকর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন। বাংলায় ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় মেদিনীপুরের নারীরা বিশেষ

বীরত্ব প্রদর্শন করেছিল। মেদিনীপুরের 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' এ মহিলারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাদের নিয়ে গঠিত 'ভগিনী সেনা' এর প্রমাণ। 'গান্ধি বুড়ি' নামে খ্যাত মাতঙ্গিনী হাজরার আত্মত্যাগ সর্বজন বিদিত। বীরভূমে বিশেষত শান্তিনিকেতন ভারতছাড়ো আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্য নন্দিতা কৃপালনী, রানি চন্দ, এলা দত্ত, সুনীতা সেন, সিউড়ির লাবণ্যপ্রভা দত্ত, রামপুরহাটের মায়া ঘোষ প্রমুখ বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সামিল হয়ে মেয়েদের যৌন হেনস্থাও সহ্য করতে হয়েছে। যদিও যে ইতিহাস এ যাবৎ লেখা হয়েছে তা এই বিষয়ে বিশেষ উচ্চবাক্য করেনি। শহুরে এলিট মেয়েরা পার পেয়ে গেলেও স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী গ্রাম-গঞ্জের মেয়েরা নিদারুণ যৌন অত্যাচারের শিকার হয়েছিল। ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময় মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমায় একদিনে ৭৪ জন মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছিল। তবে দেহের শুচিতা বিনষ্ট হয়েছে বলে তারা লজ্জায় মুখ লুকিয়ে বসে থাকে নি, তারা তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের দরবারে অপরাধীদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছেন।[৯]

মুসলিম মহিলারাও পিছিয়ে ছিলেন না। জোবেদা খাতুন এর নেতৃত্বে শ্রীহট্টে 'মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ' সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। এতে যোগ দেন সুভাষচন্দ্র বসু, ঊর্মিলা দেবী, শান্তি দাস প্রমুখরা। এছাড়া এই আন্দোলনে দৌলতউন্নিসা খাতুন, রাজিয়া খাতুন, হালিমা খাতুন, হোসেনারা বেগম, ফুলবাহার বিবি প্রমুখরা অংশ নিয়েছিলেন। সাহিত্যিক বেগম রোকেয়া মুসলিম নারী মুক্তি আন্দোলনে অনেকটা সাহায্য করেছিলেন মুসলিম মেয়েদের সমাজের কঠিনপর্দা ঠেলে বেরিয়ে আসতে। তিনি সরাসরি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ না নিলেও মুসলিম মেয়েদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন ,শিক্ষার আলোকে যারা সমাজের বাধা নিষেধের বেড়াজাল থেকে বেড়িয়ে দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে ভারতবর্ষে বামপন্থী ভাবধারার বিস্তার ঘটতে থাকে। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি নারী সমাজকে অধিকার সচেতন করে তোলার জন্য খুবই সক্রিয় ছিল। বামপন্থীদের তৎপরতায় বিভিন্ন শ্রমিক ও কৃষক সভাগুলির সদস্যপদে নারীদের উল্লেখযোগ্য যোগদান ছিল। ১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলে গ্রামের মেয়েরা অনেকেই বামপন্থী রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯৪০ এর দশক থেকেই কমিউনিস্ট পার্টিতে অনেক মহিলা যোগ দিতে থাকেন। ১৯৪১ সালে কমিউনিস্ট প্রভাবাধীন 'ছাত্র ফেডারেশন' এ মহিলা সদস্য ছিলেন প্রায় পঞ্চাশ হাজার। বামপন্থীরা 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি গঠন' ও 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' সংগঠনের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের একত্রিত করেন। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে ত্রান বন্টনের সময় বামপন্থী মহিলা কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। বাংলায় ১৯৪৬ সালে 'তেভাগা আন্দোলনে' ও অন্ধ্রপ্রদেশে 'তেলেঙ্গানা আন্দোলনে' (১৯৪৬-৫১ খ্রীঃ) বামপন্থীরা নারীদের সংগ্রামে সামিল করেন।

'খেতের ফসল তিন ভাগ হবে, দুই ভাগ গৃহ মূষিকের
উনুনের চারপাশে বসে হাত গরম করেছি,
দূরের চাষিকে শালপাতা মুড়ে খবর পাঠাও

আনো কেরোসিন, যদি দরকার হয় আগুন জ্বালাব'।

তেভাগা আন্দোলনের দাবী ছিল উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে চাষি ও এক ভাগ পাবে জোতদার। এই আন্দোলন ছিল জোতদার-জমিদারদের বিরুদ্ধে বর্গাচাষিদের আন্দোলন। তেভাগা আন্দোলনে কৃষক ঘরের নিরক্ষর মহিলাদের ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। নিছক স্বেচ্ছাসেবী নয় – তারা প্রত্যক্ষ জোতদারের লেঠেল, গুন্ডা ও রাষ্ট্রের পুলিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নারীরা গড়ে তোলেন 'ঝাঁটা বাহিনী', 'বঁটি বাহিনী', 'গায়েন বাহিনী' ইত্যাদি। জাতপাতের বেড়াভেঙ্গে মহিলারা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল হন। তেভাগা আন্দোলনে জলপাইগুড়ির বুড়িমা, মেদিনীপুরেরে বিমলা মণ্ডল, দিনাজপুরের রাজবংশী কৃষক বধূ জয়মনি, দ্বীপশ্বরী, শিখা বর্মণ, জয় বর্মনী, মতি বর্মনী, কাকদ্বীপের উত্তমী, বাতাসী বাবীর মাতা অহল্যা প্রমুখের নাম স্মরণীয়।[১০]

উপসংহার

যাইহোক এত সব বলার পরেও আমাদের স্বীকার করতে হবে শত শত বাঙালী মহিলারা ভারতবর্ষে রাস্তায় মিছিল করে বেড়িয়েছিলেন, জেলে গিয়েছেন, সেখানে অমর্যাদা ভোগ করেছিলেন, আবার নিজেদের পরিবারে ফিরেও এসেছিলেন, কিন্তু তাদের গায়ে কোন কলঙ্কের ছাপ পড়েনি। এখানেই ভারতীয় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন চোখে পড়ে। বিংশ শতকের শুরুর দিকে নতুন চেতনার জন্ম, নারীদের নতুন সংগঠন, রাজনীতি সচেতনতা সত্যিই এগুলি কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছিল। তবে উপনিবেশিক ভারতে নারী সমস্যা যতটা প্রাধান্য পাওয়া উচিত ছিল ততটা বোধ হয় পায়নি। যদিও কিছু মহিলা সচেতন হয়ে ওঠে এবং রাজনৈতিক সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় এবং উদীয়মান জাতির সঙ্গে নানাভাবে নিজেদের অভিন্ন মনে করে, তবুও নারীবাদ তখনও মুক্তির প্রচলিত ভাবাদর্শের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ওঠেনি। সম্প্রদায় ও জাতির স্বার্থ তখনও নারীদের অধিকারের উপরে বিরাজ করত। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যেকোন জাতীয়তাবাদী নেতাদের, সম্প্রদায়ের প্রধানদের বা দলের কর্তাদের দ্বারা সমর্থিত প্রবল পিতৃতান্ত্রিক প্রথার বাইরে 'স্বাধীনতার স্বপ্ন' দেখেনি।

তথ্য সূত্র নির্দেশিকা

১. Partha Chatterjee, 'The Nation and its Fragments, Colonial and Post Colonial Histories, New Delhi, 1995, p-119.

২. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পলাশী থেকে পার্টিশন, আধুনিক ভারতের ইতিহাস' ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান, কলকাতা, ২০০৮, পৃ-৪৫৫।

৩. Tapati Guha, Thakurta, 'The making of a new 'Indian' art: artists, aesthetics and nationalism in Bengal, c.1850-1920.', Cambridge University Press, 1992, p- 255.

৪. শুচিব্রত সেন, অমিয় ঘোষ, 'আধুনিক ভারত, ১৮৮৫-১৯৬৪: রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক ও সংস্কৃতিক ইতিহাস', মিত্রম প্রকাশনী, আগস্ট ২০০৮, কলকাতা, পৃ-৩৩৬।

৫. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস, ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০১, পৃ- ৮২।

৬. ভারতী পত্রিকা, সংখ্যা- পৌষ, ১৩১২ সন।

৭. কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নারী শ্রেণী ও বর্ণ', নিম্নবর্গের নারীর আর্থ সামাজিক অবস্থান, মিত্রম প্রকাশনী, এপ্রিল ২০০৯, কলকাতা, পৃ-১৪৮।

৮. খায়রুন্নেসা খাতুন, 'স্বদেশানুরাগ', নব নূর, তৃতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩১২, পৃ-২১।

৯. অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঘরে বাইরে; স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙালী মেয়েরা', প্রবন্ধ, ১৫ মার্চ, ২০২২।

১০. লিপিকা ঘোষ, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারীরা, প্রবন্ধ, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১।

বিধানচন্দ্র রায় ও তাঁর সময় ২৪ পরগনার বসতি স্থাপনের ধারাঃ একটি পর্যালোচনা

ডঃ বিপুল মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
রানাঘাট কলেজ, নদীয়া

সারসংক্ষেপ

দেশভাগ পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মতো এ জেলাতেও উদ্বাস্তু আগমনের প্রভাব পড়েছিল; এই সব উদ্বাস্তু পরিবার গুলিকে কোথায় কিভাবে বসতি স্থাপন করা যাবে এটা ছিল মুখ্য বিষয়। যেহেতু এই অঞ্চল ছিল কয়েক হাজার ম্যানগ্রোভ অরণ্যে আবৃত্ত ফলে সেই অরণ্য ধ্বংস করে যাতে বসতি গড়ে না ওঠে সেদিকেও লক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল। তাই এই জেলাতে বসতি স্থাপনের বিষয়ে বিশেষ কিছু চিন্তা ভাবনা নেওয়া হয়েছিল, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় এবিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বনভূমির কোন অংশে যাতে বসতি বিস্তার না ঘটে সে বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই সময়ে বিশেষ করে যে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার গুলি এখানে এসেছিল তাদের কিভাবে এবং কোন কোন অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলার জন্য নির্বাচিত করা হবে সে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছিল।

শব্দ সূচক- দেশভাগ, উদ্বাস্তু, ২৪ পরগনা, ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, বসতি স্থাপন, বনভূমি, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণি।

দেশভাগ জনিত সমস্যা নিয়ে সারা দেশের মতো আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও তাঁর সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়েছিল। বিশেষ করে সীমান্তবর্তি রাজ্য গুলির সমস্যা ছিল আরও বেশি সমস্যা সঙ্কুল। স্বাধীন পরবর্তী ২৪পরগনা জেলাও এই উদ্বাস্তু আগমন থেকে মুক্তছিল না। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মতো ২৪পরগনার ভূমিগত গঠন ছিল কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। ফলে এই অঞ্চলে বসতি স্থাপনের ধরণ কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়টি ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ উপনিবেশিক সময়কাল থেকে সুন্দরবন একটি পৃথক অরণ্য অঞ্চল হিসাবে গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। ফলে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এই অঞ্চল নিয়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান চন্দ্র রায় এ বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন এবং তাঁর সময় ২৪পরগনার এই অঞ্চল নিয়ে বিশেষ কিছু পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। প্রথমে যে বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন সেটি হল এই অঞ্চলে উদ্বাস্তু আগমন ও তাদের বসতি স্থাপন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন ভারত স্বাধীন হওয়ার পর পরই পূর্ব-পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুদের আগমন সমানভাবে চলতে থাকে। ১৯৫১র জুন মাস থেকে পূর্বের বছর গুলির তুলনায় উদ্বাস্তুদের আগমনের হার আরও বাড়তে শুরু করে। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে ১৯৫১ সালে পাকিস্তান; কাশ্মীর প্রশ্নে আমার জ্বলে উঠলে শুরু হয় পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও সংখ্যালঘু নির্যাতন। ঐ সময় পূর্ব-পাকিস্তানে যে সমস্ত সংখ্যালঘু হিন্দুরা ছিল তারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে থাকে, এবং নিজেদের নিরাপত্তার

কথা ভেবে পশ্চিমবঙ্গের দিকে পা বাড়াতে শুরু করে। ক্রমান্বয়ে এই ভাবে সংখ্যালঘুদের আগমন চলতেই থাকল। কিন্তু হঠাৎ করে ভারত ও পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে এই অবাধ যাতায়াত বন্ধ করার জন্য সরকার থেকে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করল, দুই দেশের সরকার সিদ্ধান্ত নিল যে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার জন্য অনুমতি পত্রের প্রয়োজন। এবং এর ফল হিসাবে ১৯৫২ সালের ডিসেম্বরের পর থেকে পাসপোর্ট চালু করার কথা ঘোষণা করা হয়। ফলে পূর্ব-পাকিস্তানে যে সমস্ত হিন্দুরা ছিল তাদের মনে ভয়ের সৃষ্টি হয়, এই ভেবে যে যদি পাসপোর্ট প্রথা চালু হয়ে যায় তাহলে তারা আর ভারতে আসতে পারবে না। নিজেদের আত্মীয়স্বজন যারা পশ্চিমবঙ্গে থেকে গেল তাদের সঙ্গে আর ইচ্ছে মতো আর দেখা সাক্ষাৎ করা যাবে না। যখন খুশি ইচ্ছে মতো আর ভারতে আসা যাবে না। ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষদের মনে এই সব ভাবনা চিন্তা কাজ করছিল। ফলে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ তারা আবার পশ্চিমবঙ্গর সীমান্তবর্তি জেলা গুলিতে চলে আসতে শুরু করল। ২৪ পরগণা জেলাও এই উদ্বাস্তু আগমন থেকে বাদ পড়েনি। এ প্রসঙ্গে বরুন দে ২৪ পরগণা ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ারে উল্লেখ করেছেন- 'In the 1951-61 decade, the on flow of refugees from erstwhile East Pakistan not only continued unabated, but actually had sudden increase just before the introduction of passport for travel between India and Pakisthan in 1952.'[১] ১৯৫৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ২৪ পরগণা জেলাতে হিসাব করলে দেখা যায় যে প্রায় ৮,০০,০০০ শরণার্থী তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে চলে এসেছিল।[২]

১৯৫১-৬১ এই দশকে এই বিপুল জনসংখ্যা শুধু মাত্র তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে আসা 'উদ্বাস্তু অভিবাসন' বা Immigration of Refugees এই অভিধায় ব্যাখ্যা করা যাবে না। এর সঙ্গে অন্যান্য কারণও ছিল। ১৯৬১ সালের সেন্সাসে দেখা যাচ্ছে ২৪ পরগণা জেলাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ৪০.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯৫১ সালের জনসংখ্যার রিপোর্টের তুলনায়। বরুন দের মতে, এই দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যান্য সম্ভাব্য যে কারণগুলি ছিল সেটি হল জনস্বাস্থ্য বিশেষ উন্নতি, অনেক রোগ প্রতিরোধ করা গিয়েছিল। অনেক ব্যাধির নিরাময় করা সহজ হয়েছিল। চিকিৎসা পরিষেবা আরও অনেক বেশি বিস্তার লাভ করেছিল ফলে চিকিৎসার সুবিধা সবাই পেতে থাকল। এর ফলে মানুষের মৃত্যুর হার অনেকটা কমতে শুরু করল। বিগত দশকগুলিতে ম্যালেরিয়াতে বহু মানুষের প্রাণহানি হয়েছিল। কিন্তু এই দশকে ম্যালেরিয়াকে সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করা গিয়েছিল, জন্মের হারও এই সময় অনেক বাড়তে থাকে।[৩] ফলে এই দশকে চব্বিশ পরগণা জেলাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি শুধুমাত্র উদ্বাস্তু আগমনের কারণে ঘটেছিল সেটা নয় এর সঙ্গে অন্যান্য কারণও ছিল।

১৯৫২-১৯৫৪ এই তিন বছরে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমন অতিশয় বৃদ্ধি পায়। এই সময় পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমনের সংখ্যা সরকারি হিসাব মতো ৩ লক্ষ ১৬ হাজার। ফলে এতো সংখ্যক উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে সরকার পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় উদ্বাস্তুদের জন্য বহু ক্যাম্প স্থাপন করতে হয়।[৪]এই নব উদ্বাস্তুদের কিভাবে পুনর্বাসন দেওয়া যাবে তার জন্য পুনর্বাসন দপ্তরে এক দীর্ঘ সম্মেলন হয়। রিলিফ কমিশনার শ্রী হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়- এর সভাপতিত্বে পুনর্বাসন দপ্তরের বিভিন্ন শাখার প্রধানদের সঙ্গে এক দীর্ঘ আলোচনা হয়। এবং সেখানে নতুন আশ্রয় শিবির খুলিবার

প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আনন্দবাজারের প্রতিবেদন অনুযায়ী- সরকারি পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৫১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ১,৬৪,৩৭৭ টি পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তু পরিবারকে জমি দেওয়া হয়।[৫]

উদ্বাস্তুদের মধ্যে অনেকেই যে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে এসেছিল একথা সহজেই অনুধাবন করা যায়। এ প্রসঙ্গে প্রফুল্ল চক্রবর্তী 'প্রান্তিক মানব' এ উল্লেখ করেছেন-

"জবর দখল কলোনির উদ্বাস্তুদের অধিকাংশই এসেছিল নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে। তাদের যৎকিঞ্চিত আর্থিক সঙ্গতি ছিল। তাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল, সাংগঠনিক সামর্থ্য ছিল। তাই তাঁরা নিজেদের ভাগ্য জয় করার প্রচণ্ড সংগ্রামে জয়ী হয়েছিল। কিন্তু যেসব উদ্বাস্তু এসে সরকারি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের অধিকাংশই ছিল কৃষক, জেলে, তাঁতি, মিস্ত্রী, গ্রামীণ স্কুল শিক্ষক প্রভৃতি; সংক্ষেপে গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত মানুষ। এরা একেবারে সর্বহারা হয়ে এদেশে এসেছিল।"[৬]

উল্লেখ করা প্রয়োজন এই সব নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেকেই এখানে এসে বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। যেমন একটা হিসাবে দেখা যায় যে- ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে ওয়ার্ক সাইট ক্যাম্পে মাটি কাটার কাজে নিযুক্ত অনেকেই ছিলেন শিবিরবাসী উদ্বাস্তু। যাদেরকে এই চব্বিশ পরগণা জেলায় কয়েকটি স্থানে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

সারণি- ১.[৭] (বিভিন্ন অঞ্চলে নিযুক্ত মাটি কাটার শ্রমিক)

চব্বিশ পরগণা

মালঙ্গা	৭০১
কালিকাপুর	২৪৭
নন্দন নগর	১,৫৯৩
বাগজোলা	৫,০৪৬
সন্তোষপুর	৫৩৩
সোনারপুর	৬,৬৪৭
তালদি	৬৪৬
বাহির সোনা	১,৮০৯
আস্রাফাবাদ	৭৯৩
বালটিয়া	২,১২১
রানিগাছি	১,১৪৩
কুন্তি	২০
মোট	২১,৪৮৩

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এই সব উদ্বাস্তু মানুষদের কিভাবে পুনর্বাসন দেওয়া হবে সে বিষয় নিয়ে পুনর্বাসন দপ্তরে আলোচিত হয়েছে। নুতন জমি সংগ্রহের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। শুধু এই কাজের জন্যই পুনর্বাসন বিভাগে একজন ডেপুটি কমিশনার নিয়োগ করা হয়েছিল। উপযুক্ত ভূমি

সংগ্রহের কাজ এগিয়ে চলেছিল শ্রী বিমলাকান্ত লাহিড়ী ও তার সহকারী শ্রী অবনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় ভূমি সংগ্রহের কাজ অব্যহত গতিতে এগিয়ে চলেছিল। ফলে অনেক উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসন সম্ভব হয়েছিল। এই সময় আরও একটি সমস্যা দেখা দেয় জমির চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জমির মূল্য বাড়বার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। বলা বাহুল্য সরকার এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন এবং এই সম্ভাবনা নিরোধের জন্য তাঁরা একটি নতুন বিধি বিধান সভায় পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন। এটির নাম 'পশ্চিমবঙ্গ ভূমি উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিধান' (West Bengal Land Development and planning Act. (Act XXI of 1948)। এর পেছনে দুটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, জমির দামের ঊর্ধ্বসীমা বন্ধ করা এবং দ্বিতীয়ত, জমি হুকুম দখলের কাজ ত্বরান্বিত করা। বলাইবাহুল্য এই আইন প্রণয়ন করার জন্য যে বোর্ড গঠন করা হয়েছিল তার সভাপতি ছিলেন ডঃ বিধান চন্দ্র রায়। ঠিক এই আইনের পরবর্তী ফল হিসাবে বলা যায় যে, চব্বিশ পরগণার সোনারপুর থানার লস্করপুর গ্রামে অনেক পতিত জমি পড়েছিল যেখানে মাটি কেটে ইট বানান হত।এখানে বোর্ড মনে করেছিল ইট আরও দূরে উৎপাদন করলেও চলবে কিন্তু যারা অকৃষিজীবী উদ্বাস্তু তাদের জন্য কলিকাতার সংলগ্ন অঞ্চলে জমি সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয়। কারণ সেখানে পুনর্বাসন পেলে তাদের জীবিকার সমাধান সহজ হয়ে যায়।[৮]

পূর্বপাকিস্তান থেকে চলে আসা মানুষজনের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া জেলা। যদিও এর বিশেষ কিছু কারণ ছিল কলিকাতা শিল্প অঞ্চলের কাছে হওয়ায় চব্বিশ পরগণার আকর্ষণ ছিল। ইতিমধ্যে শুরু হয় নতুন আর এক সমস্যা। স্বাধীনতার পর পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে যাতায়াত করার জন্য কোনও পাসপোর্ট প্রথা ছিল না। কিন্তু ১৯৫২ সালের ১৫ই অক্টোবর পাকিস্তান এককভাবে পাসপোর্ট প্রথা প্রবর্তন করে। সুতরাং ভারতও এই সময় পাসপোর্ট প্রথা প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়। ভারত এই ব্যবস্থা গ্রহণ করায় ভারতীয় মুসলমানরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করে নি। কিন্তু তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল কারণ তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের মধ্যে ছিল। তারা ভেবেছিল যে, পাসপোর্ট প্রথা চালু হলে আর কোনদিন ভারতে যাওয়া যাবে না ফলে এখানে যে সমস্ত হিন্দুরা ছিলেন তারা কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।[৯] আর এই ভয়ে অনেক হিন্দু চিরদিনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হয়। কারণ পাসপোর্ট প্রথা চালু হলে তাঁরা আর অবাধে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা পার হতে পারবে না। আত্মীয় পরিজন যারা পশ্চিমবঙ্গে থেকে গেল তাদের সঙ্গে আর দেখা করা সম্ভব হবে না। এই সব দিক চিন্তা করে তাঁরা অনেকেই বিশেষ করে হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে থাকে।

তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান থেকে যারা চলে এসেছিল তাদের মধ্যে বেশীরভাগই ছিল তপসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষেরা, যারা মূলত কৃষি শ্রমিক এবং কারিগরি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই সমস্ত মানুষজন মুলত গ্রাম অঞ্চলের দিকে বেশি করে থাকতে শুরু করে। ১৯৫১ সালের জন গণনায় পশ্চিমবাংলায় তপসিলি জাতির জনসংখ্যা ছিল মোট ৪৬,৯৬,২০৫ জন, তপসিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ১১ লক্ষ ৬৫ হাজার। এর মধ্যে শুধু ২৪ পরগণা জেলাতে তপসিলি জাতিভুক্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ৫২ হাজার। [১০]

সারণি- ২

জেলাতপসিলি জাতিভুক্ত মানুষের সংখ্যা

২৪ পরগণা	১০ লক্ষ ৫২ হাজার
বর্ধমান	প্রায় ৬ লক্ষ
মেদিনীপুর	প্রায় ৫ লক্ষ
বাঁকুড়া	৪ লক্ষ
মুর্শিদাবাদ	২ লক্ষ
নদীয়া	১ লক্ষ ৯১ হাজার
জলপাইগুড়ি	১ লক্ষ ৮৯ হাজার

উপরি উল্লেখিত তথ্য থেকে বলা যায় সীমান্তবর্তী জেলাগুলির মধ্যে একমাত্র চব্বিশ পরগণা জেলাতে তপসিলি জাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সংখ্যা সর্বাধিক। সেন্সাস কর্তৃপক্ষের মতে গত ত্রিশ বছরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলি হল –

১) যাতায়াতের সুবিধা।

২) খাদ্যের সংস্থান।

৩) কৃষিপণ্যের বাজার প্রসারিত হওয়ার ফলে কৃষকের অধিক মূল্য প্রাপ্তি এবং আর্থিক উন্নতি।[১১]

পূর্ব-পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গের যত গুলো জেলা আছে তার মধ্যে ২৪ পরগণার আয়তন ছিল সর্বাধিক ১৪,১৩৬ বর্গ কিলোমিটার। ফলে সীমান্তবর্তী অন্যান্য জেলা গুলির তুলনায় ২৪ পরগণার জেলাতে উদ্বাস্তুদের অভিবাসন সর্বাধিক মাত্রায় ঘটেছে। যোগাযোগের সুব্যবস্থা অর্থাৎ রাস্তা-ঘাট এবং নদীপথে সহজেই পূর্ব-পাকিস্তান থেকে এখানে আসা যেত। আরও একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এখানে জেলাকেন্দ্রিক শহর গড়ে ওঠায় লোকসংখ্যার পরিমাণ দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময় দমদম ও খড়দা এই দুই থানা সংলগ্ন এলাকাতে জনসংখ্যার পরিমাণ সব চেয়ে বেশি ছিল। এই দুই প্রাধান্য পূর্ণ শহর এলাকাতে ১৯৫১-৬১ এই দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে দমদমে ৫১.৭ শতাংশ এবং খড়দাতে ৫১.৩ শতাংশ। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের সীমান্তবর্তী বনগাঁ, গাইঘাটা ছাড়াও হাবড়া, জয়নগর এবং নামখানা এই পাঁচটি থানা সংলগ্ন এলাকাতে মোটামুটি ভাবে ৪০ শতাংশ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

জয়নগর এবং নামখানা বাদ দিয়ে অন্যান্য সমস্ত থানা অঞ্চল গুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য। বাস্তবিক পক্ষে জয়নগর এবং নামখানা থানা অঞ্চলগুলিতে সেখানকার প্রকৃত বাসিন্দাদের থেকেও বাইরে থেকে আসা উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল বেশি। অন্যদিকে বেহালা, মেটিয়াব্রুজ, টালিগঞ্জের মতো কলকাতা শহরের থানা অঞ্চল গুলিতে ১৯৫১-৬১ এই দশকে

জনসংখ্যা তুলনায় কম ছিল। আলিপুর সদর মহাকুমা ও ডায়মন্ডহারবার মহাকুমার কুলতলি ও কুলপি থানা অঞ্চলে জনসংখ্যার পরিমাণ কম ছিল।

সংবাদ পত্রেও এই জেলায় আগমনের বিবরণ পাওয়া যায় আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী –

পূর্ববঙ্গে খুলনা জেলার সাতক্ষীরা এবং সদর মহাকুমার অভ্যন্তরে পল্লী অঞ্চল হইতে বিপুল সংখ্যক হিন্দু গত কিছুকাল যাবৎ উদ্বাস্তু হইয়া বসিরহাট মহাকুমায় আসিয়া পৌঁছিতেছে।

বসিরহাটের নিকটবর্তী ইছামতীর পরপার হইতে দৈনিক তিন শতাধিক নতুন উদ্বাস্তু নরনারী ও শিশু বসিরহাটে আসে। তাহাদের কেওহ নৌকাযোগে আবার কেহ বা পদব্রজেই সীমান্ত অতিক্রম করিতেছে।

খুলনা জেলার ঐ অঞ্চল হইতে নবাগত উদ্বাস্তুদের গ্রহণ এবং স্থানান্তরের জন্য প্রায় এক মাস পূর্বে বসিরহাটে পশ্চিমবঙ্গের সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগ হইতে একটি কেন্দ্র খোলা হয়। সপ্তাহে দুইদিন তথা হইতে গড়ে প্রায় সার্ধ শতাধিক লোককে উদ্বাস্তু পরিচয়পত্র সহ ট্রেনযোগে কলকাতা পাঠানো হয়।

এখানে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাতক্ষীরা ও সদর মহাকুমার অভ্যন্তরে পল্লীঅঞ্চলে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর কিরূপ অত্যাচার চলিতেছে। তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত অতি নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া গিয়েছে। অত্যাচারের দিক দিয়ে এই গুলি যেমনি ভয়াবহ তেমনি মর্মন্তুদ। সংখ্যালঘুদের গৃহ হইতে গরু-বাছুর প্রভৃতি গৃহপালিত পশু অপহরণ, বাড়িতে জোর করিয়া ঢুকিয়া যথা সর্বস্ব লুণ্ঠন, ভীতি প্রদর্শন হিন্দুগৃহের সন্মুখে হয় কোরবানী, যুদ্ধের নামে অর্থ আদায়, মন্দির অপবিত্রকরণ এবং বিগ্রহের ক্ষতি সাধন, ব্যবসা বানিজ্য এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে হিন্দুদের বয়কট সর্বোপরি অসহায় নারীর উপর লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের সব ভয়াবহ কাহিনী পাওয়া গিয়েছে, অনুরূপ ঘটনা সভ্যজগতের কোথাও পাওয়া যাইবে না। অপমান ও মৃত্যুর ভয়ে ভীতিবিহ্বল হইয়া নরনারী যথা সর্বস্ব ফেলিয়া ভিখারি বেশে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছে। পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণপূর্ব সীমান্তবর্তী গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় দশঘণ্টা ক্রমাগত ঘুরিয়া নবাগত উদ্বাস্তুদের নিকট হইতে খুলনা জেলারই অঞ্চলের একটা সম্যক ছবি পাওয়া যায়।'[১২]

জনসংখ্যার এই দ্রুত হারে বৃদ্ধির জন্য বিশেষ করে অর্থনীতিবিদরা এবং সরকারও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং ১৯৬১ সালের জনগণনায় ভয়ঙ্করভাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি দেখে তারা এটাকে নিবারণ করার পথও উপায় খুঁজতে শুরু করেছিলেন। সে জন্য জেলাগুলিতে পরিবার পরিকল্পনা নীতি গ্রহণ করা হয়। ১৯৫১-৬১ এই দশকে প্রতিবছর ৪.১ থেকে কমিয়ে ১৯৬১-৭১ দশকে ৪.৩ শতাংশে আনার কথা বলা হয়। পরবর্তী দশকে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা অনেক কমে যায়। তার কারণ ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। তবে ২৪ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে জনসংখ্যা তার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল নতুন অভিবাসিত মানুষদের নিয়ে।[১৩]

১৯৫১-৬১ সাল পর্যন্ত এই দশকে ২৪ পরগণা জেলাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১৬,৭১,৬০৬। আর এতো সংখ্যক মানুষ বৃদ্ধির কারণ পূর্ববঙ্গ থেকে মানুষজনের চলে আসা। বিগত দশকের তুলনায় সব থেকে বেশি সংখ্যক উদ্বাস্তু এখানে এসে বসতি গড়ে তুলেছে। ১৯৫১ সালের

সেন্সাস রিপোর্টে ২৪ পরগনায় মোট জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল ৪৬,০৯,৩০৯ জন। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনঘনত্বের পরিমাণ ছিল ৩১৬ জন। ১৯৬১ সালের ২৪পরগণাতে মোট জনসংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ৬২,৮০,৯১৫ জন অর্থাৎ বিগত দশকের সেন্সাস্ রিপোর্টের তুলনায় জনসংখ্যা বেড়েছে ১৬ লক্ষ ৭১ হাজার ৬০৬ জন। এই সালে জনঘনত্বের পরিমাণ ছিল ৪৫৯ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটারে। সুতরাং এই বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবেশের উপর বিশেষ করে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর একটা চাপ তৈরি হয়েছিল এবং এই বাসস্থানের জন্য ভূমি ব্যবহারের ফলে কৃষিযোগ্য চাষের জমিও এই সময় কমতে শুরু করে। ফলে বনভূমির উপর চাপ ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছিল। মনুষ্য বসতি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বনভূমির উপর তার নির্ভরতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এর ফলে বিপুল পরিমাণ জঙ্গল ক্রমশ হাসিল হতে থাকে। ১৯৫১তে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ০.১৩ শতাংশ কিন্তু এর পূর্বে ১৯৪১ সালে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ০.১৭ শতাংশ ফলে বোঝা যাচ্ছে বিগত দশকে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমেছে ০.৪ শতাংশে।[১৪] ফলে দেখা যাচ্ছে যে, মনুষ্য বসতি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে চাষযোগ্য জমির পরিমাণও কমতে শুরু করেছে। ২৪ পরগণা জেলাতে চাষযোগ্য জমি ছাড়াও সুন্দরবনের বনভূমির উপরও মানুষের হস্তক্ষেপ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

এই দশকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। ১৯৫৪ সালের জুনের পূর্বে এবং ১৯৫৪ সালের জুনের পরে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের যে বাধা-নিষেধ ছিল তা অনেকটা সহজ করা হয়। এখন উদ্বাস্তুরা নিজেরা নিজেদের পছন্দ মতো জমি খুঁজে নিতে পারত।[১৫] এর ফলে দেখা যায় যে উদ্বাস্তুরা নিজেদের ইচ্ছেমত জমি ব্যবহার করতে শুরু করেছে। এখানে সরকারের পক্ষ থেকে ঠিক করা হল না বা এমন কোনও নীতিও গ্রহণ করা হল না যে কোন অঞ্চলে বসতি গড়ে উঠবে আর কোন অঞ্চলে বসতি গড়ে উঠবে না অর্থাৎ সরকারের পক্ষ থেকে সুন্দরবনের বসতি স্থাপনের কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নি। তাহলে হয়তো সুন্দরবনের অরণ্যভূমি কিছুটা হলেও রক্ষা পেত।

১৯৫৯ সালে বাগজোলা ক্যাম্পে ১৮৭টি উদ্বাস্তু পরিবার ছিল এই পরিবারগুলির মোট লোকসংখ্যা ছিল ৭৫০।[১৬] এই পরিবারগুলি এখান থেকে চলে গিয়ে সুলনবুরী নামক স্থানে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করলে পুলিশ তাদের বাধা দেয় এবং তাদের নাম রেজিস্টার বই থেকে কেটে দেবে বলা হয়। এই সময় উদ্বাস্তুরা নিজেদের বসতি স্থাপন নিয়ে যেমন সমস্যার সন্মুখীন হল তেমনি তারা বুঝতে পারছিল না ঠিক কোথায় গিয়ে তার তাদের বসতি গড়ে তুলবে। সরকারি পক্ষ থেকে এই সময় যদি উদ্বাস্তুদের জন্য সঠিক বসতি স্থাপনের জায়গা নির্বাচন করতে পারত তাহলে হয়তো সুন্দরবন অঞ্চলে বনভূমি ধ্বংসের পরিমাণ কিছুটা হলেও কমান যেত।

১৯৫৬ সালের মে মাসে ঢাকায় দুই দেশের মন্ত্রী বৈঠকে এই উদ্বাস্তু আগমনের প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাকিস্তান সরকারের উপর সংখ্যালঘুদের ভাগ্য ছেড়ে দিয়ে ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে ভারত সরকার উদ্বাস্তু নিয়ন্ত্রণ আদেশ কার্যকর করলেন। মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যাপারে শর্তাবলী আরোপিত হল এরপর ১৯৫৭ সালে দার্জিলিংএ মন্ত্রী সম্মেলনে উদ্বাস্তু আগমন বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৫৮ সালের মার্চের পরে যারা উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আসবেন তাদের আর কোন উদ্বাস্তু সাহায্য বা পুনর্বাসন দেওয়া হবে না। ফলে মাইগ্রেশনের এই নিয়মাবলি ফলে উদ্বাস্তু আগমনের হার

কিছুটা হলেও কমে গেলো। তবুও ১৯৫৭-৫৮ সালে বহু সংখ্যালঘু হিন্দুরা এখানে চলে আসতে থাকে। তাঁরা এসেছেন বহু কষ্ট করে এবং ভারতে পুনর্বাসনের কোন সাহায্য চাইবেন না এই প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষর করে। এই সময় ৪০ হাজার উদ্বাস্তু নকল (Duplicate) মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের সাহায্যে ভারতে প্রবেশ করেছিল। আর ১৯৫৭-৫৮ সালে ঢাকা অফিসে ৬২ হাজার মাইগ্রেশনের জন্য দরখাস্ত বিবেচনাধীন হয়ে পড়েছিল।

ভারত সরকারের এই কঠোর উদ্বাস্তু আগমন নিয়ন্ত্রণ নীতি সত্ত্বেও সরকারি হিসাব মতো ১৯৫৮ সালের ৫১ এ মার্চ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ থেকে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট সমেত (নকল সার্টিফিকেট সহ) মোট ৪ লক্ষ ৩২ হাজার উদ্বাস্তু ভারতে প্রবেশ করেছিল। এদের অনেকেই সরকারের তরফে কোনও সাহায্য পান নি।[১৭]

এই সময় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা গুলিতে জনসংখ্যার চাপ দিন দিন বাড়ছিল। ফলে এতো সংখ্যক উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ মনুষ্য বসতি স্থাপনের জন্য একটি পরিকাঠামো দরকার, কিভাবে, কোথায় তাদের পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব এটা একটা চিন্তা ভাবনার বিষয় ছিল। যেহেতু উদ্বাস্তুরা পূর্ববঙ্গীয় সীমান্ত পেরিয়ে সহজেই পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে পারছিল সেইহেতু পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে সীমান্তবর্তী ২৪ পরগণা জেলাতে জনসংখ্যার চাপ সব সময় বেশি ছিল। উদ্বাস্তুদের জন্য যে আশ্রয় শিবির তৈরি করা হয়েছিল সেখানেও মানুষের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়ছিল। তাছাড়া এতো সংখ্যক মানুষের ক্যাম্পে আশ্রয় দেওয়াও সম্ভব ছিল না। এদের জন্য স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের প্রয়োজন ছিল। এবং সেটা যতটা সম্ভব পশ্চিমবঙ্গের উপর চাপ কমিয়ে। ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের সময়ে মনে করা হল- এই সমস্ত উদ্বাস্তুদের অন্য কোথাও পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে, তা না হলে পশ্চিমবঙ্গের উপর জনসংখ্যার চাপ ক্রমশ বাড়তে থাকবে। দেশ বিভাগের পর থেকে যে পরিমাণ উদ্বাস্তুরা শিবিরে আছেন তারা যে বরাবরই শিবিরে থেকে যাবেন এমন নয় তাদের কে অন্য কোথাও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ইউ. সি. আর. সি.-র তরফে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের নিকট ১১ই আগস্ট (১৯৫৮), যে দাবি সনদ পেশ করা হয় তাতে বলে হয় "...সুন্দরবন অঞ্চলের উন্নয়ন করে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ৬২.৫ বর্গমাইল জায়গায় ৬,৮৭৫ টি পরিবার এবং মাছের ভেড়ি থেকে ১২ হাজার একর জায়গায় ৩,৩০০ টি উদ্বাস্তু কৃষি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হবে।"[১৮] ইউ সি আর সি– কর্তৃক ১১ অগাস্ট ১৯৫৮ তারিখে ডাঃ রায়কে দেওয়া এক স্মারক লিপিতে (An alternative proposal in West Bengal) দেখা যায় দুই হাজার উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য সুন্দরবনের হেড়োভাঙ্গা অঞ্চলে এগার হাজার একর জমি উদ্ধারের কর্মসূচি নেওয়া হয়। 1n the Sundarbans area at Herobhanga, a land Reclamation scheme in operation. About 11,000 acres of Land may be reclaimed through this scheme and about 200 families may be rehabilitated through it.."[১৯]। ১৩ই অক্টোবর (১৯৫৮) মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় তার ভাষণে আরও বলেন- "Reclamation of the Sundarbans Land also presents of difficult task. Rising of embankment is the least part of it. The problem is one of growing crops on the

reclaimed saline soil after an area is enclosed by rising embankment it requires at least two years to wash away the salinity of the soil and make the land fit for growing crops profitable."[২০] আসলে ডঃ রায়ের মতে সুন্দরবনের জমি পুনরুদ্ধার করা ছিল একটি কঠিন কাজ। কারণ পুনরুদ্ধারকৃত জমিগুলিকে বাঁধ দিতে হবে নদীর নোনা জলকে আটকানোর জন্য। এবং জমি গুলিকে ফসল ফলানোর উপযোগী করে তুলতে হবে। ফলে নতুন আসা উদ্বাস্তুদের বসবাসের জন্য এই অঞ্চলকে উপযুক্ত করার দিকে তাঁর নজর ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পূর্ববঙ্গ থেকে মানুষের আগমনের ঢল অব্যাহত রইল পরবর্তী দশকেও। বলা যেতে পারে ১৯৬০-৬১ তে বিপুল সংখ্যায় উদ্বাস্তু আগমনের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়ে গিয়েছিল।

তথ্যসূত্র নির্দেশিকা

১. Barun De, 24 Parganas District Gazetteers, Kolkata, 1994, p. 140.

২. *তদেব*, পৃ-১৪০।

৩. *তদেব*, পৃ-১৪০– ১৪১।

৪. জগদীশচন্দ্র মণ্ডল, মরিচঝাঁপি নৈঃশব্দের অন্তরালে, সুজন পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০০২, পৃ-১৫।

৫. আনন্দবাজার পত্রিকা ১১ই জুলাই, ১৯৫১,পৃ-৫।

৬. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, প্রান্তিক মানব, পরিবর্ধিত দীপ সংস্করণ, ২০১৩, কলকাতা, পৃ-৯৩।

৭. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্বাস্তু, পরিবর্ধিত দীপ সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ- ৪৩৪।

৮. *তদেব*, পৃ- ১৮৪-৮৬।

৯. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, *তদেব*, পৃ-১৯।

১০. শ্রী বিমল চন্দ্র সিংহ, পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস, কলকাতা, ১৩৬২, পৃ-৪-৫।

১১. *তদেব*, পৃ-২১।

১২. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫শে অক্টোবর ১৯৫১, পৃ- ৭।

১৩.বরুন দে,পৃ-১৪১

১৪. West Bengal Forest, Forest Directorate, Govt. of W.B. Kolkata, 1966 p. 270.

১৫. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ই জুলাই, ১৯৪৯, পৃ-৯।

১৬. তদেব, ১২ই জুলাই, ১৯৪৯, পৃ -৯।

১৭. জগদীশচন্দ্র মণ্ডল, *তদেব*, পৃ-১৭।

১৮. *তদেব*, পৃ-২৫।

১৯. *তদেব*, পৃ-৩৩।

২০. *তদেব*, পৃ-২৬।

উত্তর-পূর্ব ভারতে মূলধারার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী বৈষ্ণবধর্মের বিবর্তন

অসীম বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়,
গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম

সারসংক্ষেপ

পূর্ব ভারতের অন্যতম পবিত্র ভূমি বাংলার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব জনপদ ধর্মীয় ভাবাদর্শের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূচনা করেছিল সেই সুদূর অতীতকাল থেকেই। পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সেই আদর্শ নতুন আঙ্গিকে রূপান্তরিত হয়েছিল। নদিয়ানাগর নবদ্বীপ-চিন্তামণি শ্রীচৈতন্যদেব বাঙালির ধর্মীয় ও সমাজিক জীবনে এক মস্ত বড় ভাবাবেগের সঞ্চার করেছিলেন। ষোড়শ শতক থেকে যার পূর্ণাঙ্গ জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল নবরূপে নবধারায়। আজ একুশ শতকে স্বাধীনতার সাত দশক পরে এসেও চৈতন্যের ভাবান্দোলন ও ধর্মীয় আধ্যাত্মবাদ বাঙালির আপন অন্তরাত্মাকে সঞ্জীবিত করে রেখেছে; আত্মতুষ্টিতে ভরপুর করে তুলেছে বাঙালির স্বতন্ত্র সত্ত্বাকে। আর সেই সত্ত্বা নিরিখে চৈতন্য আন্দোলনের ভাবধারা উত্তরবঙ্গেও সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রবাহিত হয়েছিল সুদীর্ঘ কাল থেকেই। চৈতন্যের অনুপ্রেরণাতেই চৈতন্য পরবর্তী কালে বৈষ্ণব ধর্ম জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবতীর্ণ হয়। যদিও তাঁর অপ্রকটের পরে নানা বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন কতিপয় বৈষ্ণব সাধক ও নেতারা। তার মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন নরোত্তম দত্ত ঠাকুর বা নরোত্তম দাস ঠাকুর। তাঁর চিন্তাধারা ও চৈতন্যধর্মের আধ্যাত্মিক দর্শন উত্তরোত্তর পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলে এমন কি অসমেও চৈতন্য ধর্মের প্রভাবে বৈষ্ণব আন্দোলনকে যথেষ্ট জোরদার করে তুলেছিল। দীর্ঘ পাঁচ সাড়ে শতক পরে আজও চৈতন্যধর্ম বাঙালি তথা ভারতীয় জনমানসে নতুন মাত্রা সংযোজিত করে চলেছে প্রতিনিয়ত। উত্তরবঙ্গের রাজশাহীর খেতুরিতে নরোত্তম দাস ঠাকুর বৈষ্ণব ধর্মের ঐক্য রক্ষার্থে আয়োজন করেছিলেন সর্ববৃহৎ বৈষ্ণব মহোৎসব ও সম্মেলন। তাঁর উদ্যোগেই চৈতন্য পরবর্তীকালে মূলধারার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে যে বিভাজনরেখা তৈরি হয়েছিল, তাকে তিনি একসূত্রে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিছু অংশে তিনি সফল হয়েছিলেন, আবার কিছু অংশে তিনি ব্যর্থও হয়েছিলেন। ষোড়শ শতকের শেষার্ধের এই সম্মেলনের পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলায় বৃন্দাবনী শাস্ত্রের প্রয়োগ ত্বরান্বিত হয়েছিল। যার সূত্র ধরে আজও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম তার ভাবাদর্শ প্রচারে বৃন্দাবনী তত্ত্বের আদলে বৈষ্ণবতা প্রসারে তৎপর রয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমি, আমার এই গবেষণাপত্রে স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পরেও প্রাসঙ্গিক একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসাবে বিবেচিত নরোত্তম দাস ঠাকুরের নেতৃত্বে মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিবর্তন বিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

শব্দ সূচকঃ উত্তরবঙ্গ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, মূলধারা, কৃষ্ণানন্দ, নরোত্তম দাস (দত্ত) ঠাকুর, ভজনটুলি, খেতুরি মহোৎসব।

মূল আলোচনা

নবগৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের দু'বছর আগে ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের আবির্ভাব ঘটেছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে এবং মূলধারার বাইরে গড়ে ওঠা অনুসারী ধর্মগোষ্ঠীর অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর উত্তরবঙ্গের রাজশাহীর খেতুরি নামক গ্রামে ১৫৩১ সালের এক মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম রাজা শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত এবং মাতার নাম শ্রীমতি নারায়ণী দেবী। রাজা শ্রীকৃষ্ণানন্দ পুত্র লাভের আশায় শালগ্রামে তুলসীচন্দন দিয়ে পূজা করতেন। তাঁর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে ঈশ্বর তাঁকে এক পুত্র সন্তান উপহার দিলেন। এর ফলে রাজশাহীর খেতুরিতে পরম মঙ্গল দেখা দেয়, লোকের দূর্বুদ্ধি ঘুচে যায়, তারা আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েন। সকলের মুখেই হরি হরি ধ্বনি, তাদের হৃদয়ে ভক্তিদেবী প্রবেশ করলে তারা বিভিন্ন ভেট সামগ্রী নিয়ে রাজা কৃষ্ণানন্দের গৃহে আগমন করেন। পুত্রের কল্যাণে রাজা কৃষ্ণানন্দও ব্রাহ্মণ, গায়ক, বাদক, সূত, মাগধ সকলকে বহু ধন ও রত্ন দান করলেন। পুত্রের আবির্ভাবকালে শ্রীমতি নারায়ণী দেবী এক চমৎকার দৃশ্য দর্শন করে সুখ উপলব্ধি করেছিলেন।[১]

ভাগ্যবান রাজা কৃষ্ণানন্দ পুত্র নারোত্তমের কল্যাণের জন্য ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদের বহু সেবা যত্ন করলেন। শ্রীগৌরচন্দ্রের আকর্ষণে জন্ম লাভ করে নরোত্তম চন্দ্র দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগলেন। রাজশাহীর গড়েরহাট পরগনার গোপালপুরের রাজা শ্রীকৃষ্ণানন্দের বাসস্থান ছিল খেতুরি নামক গ্রামে। পুত্রের বয়স ছ'মাস অতিক্রান্ত হলে রাজা কৃষ্ণানন্দ অন্নপ্রাশনের আয়োজন করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। পাঁচ বছর বয়সে নরোত্তমের কর্ণভেদ অনুষ্ঠান হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে হাতে খড়ি, চূড়াকরণ ইত্যাদি যথা সময়ে সম্পন্ন হতে থাকে। বালক নরোত্তম যে বর্ণে একবার গৌরাঙ্গ নাম শ্রবণ করতেন তখনই তা কণ্ঠস্থ করতেন।[২] অল্পকালের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভজন ব্যতীত জাগতিক বিদ্যার কোনো সার্থকতা নেই- এটা তিনি বিশেষভাবে অনুভব করলেন। দিনের পর দিন নরোত্তম দাসের মন সংসারের প্রতি উদাসীন হতে লাগলো। তিনি ভোগবিলাসের প্রতি একেবারেই উদাসীন হলেন। এ সময় শ্রীনরোত্তম দাস বারো বছর বয়সে উপনীত হলেন। তাঁর সংসারের প্রতি উদাসীনতা দর্শন করে পিতা-মাতা বিবাহের জন্য প্রস্তাব তোলেন। নরোত্তম এইরকম পরিস্থিতি বিবেচনা করে মনে মনে গৃহত্যাগের পরিকল্পনা করলেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু সেই রাতে নরোত্তমকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। এবং সকালে স্বপ্নভঙ্গের পর ঘুম থেকে উঠে পিতা-মাতা বা অন্য কাউকে দেখতে না পেয়ে নরোত্তম পদ্মাস্নানে গমন করলেন। এক সময় তিনি শ্রীহরিনাম করতে করতে পদ্মাবতী তীরে উপস্থিত হয়ে প্রণাম ও বহু স্তব-স্তুতি করলেন। এরপর স্নান করলেন। তখন পদ্মাবতীর আশির্বাদে নরোত্তম বৈরাগ্য জীবনকে বেছে নেওয়ার সংকল্প করলেন। পদ্মাবতীর কাজ থেকে নরোত্তম দাস প্রেম হাত পেতে গ্রহণ করলেন এবং তিনি এইভাবে কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ প্রকাশ করলেন। নরোত্তম দাসের প্রবল বৈরাগ্য ভাব দর্শন করে পিতা-মাতা তাঁকে কড়া পাহারায় রাখেন এবং বিবাহের প্রস্তাব করেন। পরম বৈরাগ্য ভাবাপণ্য নরোত্তম রাজ ঐশ্বর্য ত্যাগ করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিজেকে সমর্পণ করে সমস্ত বৈভব ত্যাগ করলেন। তিনি কৃষ্ণ নামে নিজেকে সংকল্প করার উদ্দেশ্যে জীবনের সমস্ত আত্মসুখ বিসর্জন দিলেন।

রাজা কৃষ্ণানন্দের রাজধানী খেতুরি এক মুসলমান জায়গিরদারের অধীনে ছিল। তিনি নরোত্তমের মহৎ গুণের কথা শুনে তাঁকে দর্শন করতে চাইলেন এবং এক দূত পাঠালেন। নরোত্তম মুসলমান জায়গিরদারের আমন্ত্রণ মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের করুণা মনে করলেন। নরোত্তম তাঁর পিতা-মাতাকে বললেন-জায়গিরদারের সভায় আমি গমন করলে তিনি খুব সুখী হবেন। মাতা-পিতার নিকট থেকে বিদায় গ্রহণপূর্বক প্রহরী বেষ্টিত হয়ে জায়গিরদারের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে নরোত্তম গেলেন। অত:পর তিনি বৃন্দাবন উপভোগ যাত্রার পরিকল্পনা করেন এবং বারো বছর বয়সে তিনি বৃন্দাবন যাত্রাকালে মথুরায় এক রাত্রি বাস করলেন। মথুরায় অবস্থানের পর নরোত্তম বৃন্দাবনে এলেন এবং গোস্বামীগণের সঙ্গে তাঁর মিলন হল। তিনি দীক্ষিত হলেন শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর নিকট। পরম বৈষ্ণব হলেন। ধর্মাদর্শ এবং ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে সমর্পণ করলেন।[৩] উত্তর বাংলার এক প্রান্তিক গ্রাম খেতুরি থেকে তিনি সুদূর বৃন্দাবনে এলেন শুধু ঈশ্বর মন্ত্র গ্রহণ করার এবং মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার এবং ঈশ্বর নাম জপ করার উদ্দেশ্যে। সপ্তদশ শতকের প্রেক্ষাপটে দ্বাদশ বর্ষীয় এক কিশোরের কাছে এটা ছিল এক ধরনের চ্যালেঞ্জ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মজগতে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক ঘটনা। এরপর বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচিত এবং বিধি সম্বলিত বৈষ্ণবীয় চিন্তাধারা পূর্ব ভারতের বিশাল জনপদে ধর্ম প্রচার করার উদ্দেশ্যে বহু পুঁথিপত্র নিয়ে এবং সঙ্গী হিসাবে অপর দুই বিখ্যাত বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাধক শ্রীনিবাস আচার্য এবং শ্যামানন্দ প্রভুর সঙ্গে বাংলার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ইতিমধ্যে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল জীব গোস্বামী নরোত্তমের গুরুসেবায় পরাকাষ্ঠা, তাঁর সাধন-কজন গুণে, পান্ডিত্যের অমায়িক মধুর সদালাপে মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন আচার্যদের অনুমোদনক্রমে তাঁকে 'ঠাকুর মহাশয়' উপাধি প্রদান করা হয়।[৪] বৃন্দাবন বৈষ্ণব সমাজে তৎকালীন সময়ে শ্রীজীব গোস্বামীই ছিলেন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে উপাধি প্রদানের অধিকারী সকল ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থানরত বৈষ্ণব তাত্ত্বিক। এই উপাধি প্রদানের মাপকাঠি ছিল ভক্তি শাস্ত্রের প্রখর জ্ঞান, সাধন ভজনের সিদ্ধি লাভ অর্থাৎ ভক্তি জগতে যার যে রূপ উৎকর্ষতা, শ্রীজীব গোস্বামীই বিচার করে তাঁকে সেরূপ উপাধিতে ভূষিত করতেন। নরোত্তম ছিলেন উক্ত সমস্ত গুণের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। নরোত্তমের গুরু লোকনাথ গোস্বামীর নিকটে মহাপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত সহ বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থাদি ও শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। এভাবে তিনি নিজ গুণে বৈষ্ণব সমাজে প্রভূত সমাদর অর্জন করেন এবং ভারতবর্ষের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব সাধকে পরিণত হন।

অতঃপর নরোত্তম এবং পূর্বে উল্লেখিত তাঁর দুই সহচরকে সঙ্গে নিয়ে ব্রজমন্ডলে গমন করে দীক্ষা গ্রহণ করে গুরু সেবা, শাস্ত্র অধ্যয়ন, ভজন, ঠাকুর মহশয় উপাধি লাভ, শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীলের অজ্ঞানুসারে শ্রীগোবর্ধনে গুহাশ্রয়ী শ্রীরাঘব পন্ডিতের অধ্যক্ষতায় শ্রীনিবাস আচার্যের সঙ্গে নরোত্তম দাস ৮৪ ক্রোশ ব্রজমন্ডল পরিক্রমা করেন।[৫] এভাবে তাঁর গৌড়দেশে প্রত্যাগমনের পথ প্রস্তুত হয়। তিনি একে একে নবদ্বীপ, মায়াপুর, শান্তিপুর, কাটোয়া, কালনা, সপ্তগ্রাম, খড়দহ, খানাকুল, একচক্রা, নীলাচল প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। পরিশেষে গৌড়দেশে প্রত্যাগমনকালে বনবিষ্ণুপুরে মল্লরাজা বীর হাম্বীরের রাজ্যসীমার মধ্যে শকট সহ শাস্ত্র পুস্তকাদি চুরি গেলে শ্রীনিবাস আচার্যের নির্দেশে তিনি খেতুরিতে ফিরে আসেন।

১৫০৪ শকে বা ১৫৮২ সালে যখন শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্যামানন্দ প্রভু বৃন্দাবন হতে বৈষ্ণব শাস্ত্রাদি গ্রন্থ নিয়ে গাড়ি করে গৌড়ে আসেন, তখন তিনি ও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী বৈষ্ণবগণের সম্মতি নিয়ে গৌড়ীয় গোস্বামী গুরুবর্গের গ্রন্থরাজি গৌড়দেশে পাঠানোর জন্য উপযুক্ত যানবহন ও রক্ষী সহ শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস ঠাকুর ও শ্যামানন্দকে পাঠালেন। বনবিষ্ণুপুরের কাছে গ্রন্থরত্ন চুরি গেলে আচার্য প্রভু নরোত্তমকে খেতুরিতে এবং শ্যামানন্দকে উৎকালে পাঠিয়ে দেন। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুরই শক্তি রূপে পরিচিত ছিলেন। পদ্মা নদীর তীরে প্রেমতলি হতে উত্তর-পূর্বাংশে এক মাইল দূরে খেতুরি ছিল নরোত্তমের পিতা কৃষ্ণানন্দের রাজধানী। এখানে কৃষ্ণানন্দ ও পুরুষোত্তম দু'ভায়েরই রাজ সম্মান ছিল। পুরুষোত্তমের পুত্র সন্তোষ দত্ত নরোত্তমের অতি প্রিয় ছিলেন। রাজধানী খেতুরির দু'মাইল দূরে নরোত্তম একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন, যার নাম- 'ভজনটুলি'।[৬] বৃন্দাবন থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পরে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীরাধামোহন ও শ্রীরাধাকান্ত- এই ছ'টি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তিনি একটি বৈষ্ণব মহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন। ইতিপূর্বে চৈতন্য পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্য এবং সঠিক নেতৃত্বের অভাবে বৈষ্ণব সমাজ ভেঙে ছোট ছোট দল, উপদল, শাখা-প্রশাখা, গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়, উপ-ধর্মসম্প্রদায় গড়ে উঠলে মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক বৈষ্ণব ধর্ম জনবলের অভাবে অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এমত অবস্থায় খেতুরিতে মহাসম্মেলন করে পূর্ব ভারতীয় প্রেক্ষাপটে মূলধারার বৈষ্ণব ধর্মকে রক্ষা করার জন্য এবং বৈষ্ণবধর্মের ঐক্য ফিরিয়ে আনার জন্য এই বিশাল উৎসবের আয়োজন করেছিলেন নরোত্তম দাস ঠাকুর। বৈষ্ণব সমাজে এই উৎসব বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। বৃন্দাবন থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পরে তিনি এই কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। এই উৎসবে সারা ভারতবর্ষ থেকে শক্তিধর এবং প্রখর বৈষ্ণব শক্তি প্রদত্ত সাধক ও নেতারা সমবেত হয়েছিলেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৯৫ জন বিখ্যাত ভক্ত-সাধক এবং নেতা এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। এই সম্মেলনে নারী শক্তির অন্যতম প্রতিভু গুরুমাতা জাহ্নবা দেবী সভাপতিত্ব করেছিলেন। তিনি বৈষ্ণব সমাজে 'নারী জাগরণের শুকতারা' এবং 'ঈশ্বরী মাতা' নামে পরিচিত ছিলেন।[৭] তাঁর নেতৃত্বে সমগ্র মহাসম্মেলনটি পরিচালিত হয়েছিল। এই সম্মেলনেই চৈতন্যদর্শনের পাশাপাশি বৈষ্ণবশাস্ত্র হিসেবে বৃন্দাবনী শাস্ত্র বিধিসম্মতভাবে স্বীকৃত হয় এবং বাংলার বৈষ্ণব সমাজ বৃন্দাবনী শাস্ত্রকে মেনে নেন। অর্থাৎ বৃন্দাবনী তত্ত্বের ভিত্তিতে এখন থেকে বাংলার বৈষ্ণবগণ এবং বৈষ্ণব ধর্ম পরিচালিত হতে থাকে। এর ফলে 'হরিভক্তিবিলাস' এর মতো কঠোর ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন জনিত ধর্মীয় বিধান বাংলায় চালু হলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিপরীতে অসংখ্য লোকায়ত গৌণধর্ম শাখা-সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। যে ধর্মগুলির প্রবর্তক এবং পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বাংলার নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ শ্রেণির প্রান্তিক মানুষেরা। এছাড়াও এই সম্মেলনে নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রবর্তিত নতুন ধারার কীর্তন প্রবর্তন হয়েছিল। নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রবর্তিত কীর্তন ধারা রাজশাহীর গড়েরহাটি বা গরানহাটির নাম অনুসারে হয়েছিল। নতুন ধারার এই কীর্তনের নাম হয়েছিল গরানহাটি কীর্তন ধারা। নরোত্তম দাস ঠাকুর গরানহাটি নামক সুরের কীর্তন প্রবর্তন করে এমন ভাবে সমৃদ্ধি প্রকাশ করেছিলেন যে, তাতে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকট ও অপ্রকট লীলায় সকল পার্ষদগণই একত্র সমবেত হয়ে সকল দর্শক

এবং শ্রোতাবৃন্দের সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এরফলে নরোত্তমের এবং গৌরহরির নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তা সত্ত্বেও তিনি কায়স্থ বা শূদ্র শ্রেণির হয়ে যে ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দান করতেন, তা রক্ষণশীল সমাজ মেনে নিতে পারেননি। তখন আর এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হলো। সারা বাংলার অগ্রণী বৈষ্ণব পন্ডিতের নিমন্ত্রিত হলো, এলেন শ্রীনিবাস আচার্য, বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র, তাঁর সাধন সঙ্গী রামচন্দ্র প্রমুখ। সে সভায় বিরুদ্ধবাদীদের মতবাদ ও মতামত ধূলিস্যিৎ হয়ে গেল। নরোত্তামই 'দ্বিজ' সেই তথ্যস গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হলো।[৮] এভাবেই সকল লীলা সাঙ্গ করে একদা কার্তিক মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে গাম্ভীলায় অর্ধ গঙ্গাজলে নরোত্তম স্বেচ্ছায় অপ্রকট হলেন। তিনি যেমন পৃথক গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ছিলেন বৈষ্ণব সমাজে, তেমনি ছিলেন কীর্তনসাধক, পদকর্তা, সুকবি ও সুগায়ক এমনকি গ্রন্থকারও ছিলেন।

শ্রীনিবাসের বন্ধু ও সতীর্থ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্র করে পূর্ব ভারতে ধনী জমিদার শ্রেণির ওপর বৈষ্ণব ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। নিজে কায়স্থ হলেও বহু ব্রাহ্মণকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করে তাদের মাথায় চরণধুলি দান করেছিলেন। নরোত্তমের জীবন-কথা এক আশ্চর্য কাহিনীতে ভরপুর হয়ে উঠেছিল। শ্রীনিবাস দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও বিপুল ঐশ্বর্য ও রাজসিক জীবন যাপন করতেন। নিত্যানন্দ প্রভু জীবনের শেষাঙ্কে একই রকম বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন। অপরদিকে নরোত্তম দাস ঠাকুর রাজপুত্র হয়েও স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের মধ্যে পরমানন্দে জীবন কাটাতেন। শ্রীবাসকে রাজসিকতা স্পর্শ করেছিল, বৈরাগী নরোত্তম বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক জীবন যাপন করেছিলেন। বৃহত্তর হিন্দু সমাজে চৈতন্যধর্মের প্রভাব বিচার করলে তাঁর দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে। ধনী ভূস্বামী, দুর্দান্ত নরঘাতক ডাকাত, বিদ্বান ব্রাহ্মণ সকলেই তাঁর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়েছিল।[১০] অথচ, এই চিরকুমার সাধকের চরিত্রে বিন্দুমাত্র মলিনতার ছাপ পড়ে নি। বাংলায় মধ্যযুগীয় চরিত্রাদর্শ রূপে নরোত্তম দাস ঠাকুরের বিকল্প কেউ ছিলেন না। চাঁদ রায় নামে এক ব্রাহ্মণ দস্যু জমিদার দুর্দান্ত ও নির্মম দর্শকবৃত্তি ত্যাগ করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। চাঁদ রায়ের বহু সহযোগী বহু ব্রাহ্মণ-ডাকাতও নরোত্তমের চরণতল স্পর্শ করে ধন্য হয়েছিল। তিনি যে ব্রাহ্মণ শিষ্যদের মস্তকে চরণধূলি দান করতেন, তাকে তৎকালীন সমাজের পক্ষে একটি বড় রকমের সমাজ বিপ্লব বলা যেতে পারে।[৯] নিত্যানন্দ ও বীরচন্দ্রকে সমাজ বিপ্লবী বলা হয়েছে, কারণ তাঁরা নিচজাতি, বিশেষতঃ জাতিচ্যুত নেড়ানেড়ি অর্থাৎ বৌদ্ধ সহজিয়াদের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। কিন্তু নরোত্তমের ক্রিয়াকর্ম অধিকতর সুদূরপ্রসারী ছিল। তাঁর নেতৃত্বে পূর্বে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোনো কোনো দিক দিয়ে ব্রাহ্মণ শ্রেণির প্রাধান্য অব্যাহত ছিল। চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ-অদ্বৈত, রূপ-সনাতন-জীব-শ্রীনিবাস- এঁরা সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ। যবন হরিদাস, রঘুনাথ দাস, নরহরি সরকার, শ্যামানন্দ প্রভু- এঁদের মতো অব্রাহ্মণ বৈষ্ণব আচার্যগণ নরোত্তমের মতো ব্রাহ্মণ শিষ্যদের পদস্পর্শের অধিকার দেয়নি। তাঁর জাতিধর্মের আদর্শ সাত্ত্বিক চরিত্রের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল। মধ্যযুগের রঘুনন্দন শাসিত বর্ণাশ্রম সমাজের ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য এভাবে আর কেউ সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ করতে পারেননি-নরত্তমে জীবনের এটাই সর্বপ্রধান কৃতিত্ব। অবশ্য এর জন্য তিনি কোনদিন আগ্রহ প্রকাশ করেননি, ব্রাহ্মণ সমাজই তাঁর চরিত্রাদর্শে মুগ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। এই অভাবনীয় ব্যাপারে সমাজের উচ্চ স্তরে যে প্রচন্ড আলোড়ন শুরু হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। ভজনটুলির পাশে পক্কপল্লীর কায়স্থ জমিদার নরসিংহ রায়ের ব্রাহ্মণ প্রতিপালক ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁকে

ধরে পড়লেন, কাজ তো নরোত্তম ব্রাহ্মণদের মাথায় পদধূলি দিয়ে শিষ্য করতেন-সমাজের ভিত্তমূল যে ভেঙে পড়লো। এতে নরসিংহ বর্ণাশ্রম সমাজের মর্যাদা রক্ষার জন্য তাঁর পৃষ্ঠপোষক ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে চললেন নরোত্তমকে প্রদানত করতে, কিন্তু নিজেই সদলবলে নরোত্তমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হলেন।[১১] ব্রাহ্মণকুলে না জন্মেও নরোত্তম বর্ণের সৃষ্টির গৌরব লাভ করেছিলেন, বিশুদ্ধ চরিত্রাদর্শই এর প্রধান কারণ। অবশ্য মধ্যযুগের শেষ পর্বে সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রভাব যে খুব গর্ব হয়েছিল তা মনে হয় না। ব্রাহ্মণগণ দলে দলে কায়স্থ নরোত্তমের শিষ্য হচ্ছিল। তিনি ব্রাহ্মণদের শিরে চরমস্পর্শ দান করেছেন-এইরকম বর্ণনায় আধুনিক ঐতিহাসিক খুব উল্লাস বোধ করেছেন। কিন্তু বৈষ্ণব সমাজ-ইতিহাসে ব্রাহ্মণ প্রভাবকে খর্ব না করে বরং নরোত্তমকে ব্রাহ্মণ রূপে প্রচার করবার বিশেষ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বীরচন্দ্র খেতুরি উৎসবে সর্বসমক্ষে নরোত্তমকে ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করেন।[১২] যাইহোক নরোত্তমের সাত্বিক চরিত্রাদর্শ উত্তরবঙ্গের বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যে শুভ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করেছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। হিন্দু সমাজে, বিশেষত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তাঁর বিস্ময়কর সাত্ত্বিক চরিত্র বিপুল উদ্দীপনা সঞ্চারেরও সার্থক হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তার আরেকটি গৌরবজনক কর্মের কথা হলো- খেতুরি উৎসব। বৌদ্ধ সংগীতের মতো নরোত্তম কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ মূর্তি স্থাপন উপলক্ষে খেতুরি গ্রামে বাংলার বৈষ্ণব আচার্য ভক্তদের আহ্বান করে দুদিন ব্যাপী যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, তা বৈষ্ণব সমাজের সম্প্রদায়ের ইতিহাসে খেতুরি উৎসব নামে পরিচিত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বৈষ্ণবদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল যদুনন্দনের উদ্যোগে কাটোয়াতে গদাধর পন্ডিতের তিরোধান উৎসবে। আর দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল কয়েক মাস পরে শ্রীখন্ডে রঘুনন্দনের উদ্যোগে নরহরি সরকারের তিরোধান তিথি উপলক্ষে।

তৃতীয় মহোৎসবই বৈষ্ণব ধর্ম সমাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নরোত্তম খুড়তুঁতো ভাই সন্তোষ দত্তের সহায়তায় খেতুরিতে ছ'টি কৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ষোড়শ শতকে শেষ ভাগে খেতুরি গ্রামে বাংলা ও উড়িষ্যার বৈষ্ণবদের এক বিরাট সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। এই উৎসবে গৌড়বঙ্গ, উড়িষ্যা প্রভৃতির স্থান থেকে বৈষ্ণব আচার্য, শিষ্য ও ভক্তসম্প্রদায়, কীর্তনীয়া ও বাদ্যকরগণের আগমনে খেতুরি উৎসব বৈষ্ণব জগতে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল। আগতদের তালিকায় ছিলেন- উৎকলের সশিষ্য শ্যামানন্দ, খড়দহের বৃন্দাবন দাস, বলরাম দাস, বীরচন্দ্র সহ জাহ্নবা দেবী, অম্বিকা কালনা থেকে শ্যামানন্দের গুরু হৃদয়চৈতন্য, নবদ্বীপ থেকে মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীপতি ও শ্রীনিধি, শান্তিপুর থেকে অদ্বৈত আচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দ ও গোপালদাস, শ্রীখন্ড থেকে রঘুনন্দন, লোচনদাস, কাটোয়া থেকে সপার্ষদ যদুনন্দন দাস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। কীর্তনীয়া দেবীদাস চন্ডীদাস-বিদ্যাপতি-হরহরির পথকে বৈশিষ্ট মন্ডলীতে সাড়া জাগান। স্বয়ং নরোত্তমও তাঁর সুললিত কণ্ঠে কীর্তন গেয়ে বিপুল সাড়া ফেলেছিলেন এবং সেই থেকে কীর্তনের একটি নতুন ধারার উদ্ভব হলো-রীতিটি গড়ানহাটি বা গড়েরহাটি রীতি নামে প্রসিদ্ধ।[১৩] এই উৎসবে পূর্বে উল্লেখিত ছটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। খেতুরির মহোৎসব এইভাবে রীতি নিবদ্ধ অভিজাত প্রণালীর গীতিতে প্রচলন ও এমন বৈষ্ণব মহাসম্মেলনে আয়োজন করে নরোত্তম ঠাকুর বৈষ্ণব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার ও কীর্তনকে সগরীমায় সকলের মধ্যে বিলিয়ে দেবার যে দৃষ্টান্তমূলক অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল, তা একপ্রকার নজির বিহীন ঘটনা।

এইভাবে নরোত্তম দাস ঠাকুর পূর্ব ভারতে চৈতন্যধর্মকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আদর্শকে প্রসারিত করেছিলেন। সেই ধারাবাহিকতা আজও বহমান। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনপদে নরোত্তম দাস ঠাকুরের শিষ্য সম্প্রদায় ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পরবর্তী সাত দশক পরেও এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সেদিক থেকে বিচার করলে মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বিবর্তনের পথ ধরে বর্তমানকালে এসে উপস্থিত হয়েছে। এখনো বাংলায় উত্তর প্রান্তে তথা ভারতবর্ষের পূর্বাংশে বৈষ্ণব ধর্মের যে অসংখ্য ভক্ত-সাধক রয়েছেন তাদের বেশিরভাগই চৈতন্য শাখার অন্যতম অনুসারী বৈষ্ণবগোষ্ঠী নরোত্তম দাস ঠাকুর গোষ্ঠীর ভাবধারা দ্বারা পরিপুষ্ট। তাই একথা বলতেই হয় যে, ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে যে ধর্মীয় পরিমণ্ডল পূর্ব ভারতে বিরাজ করছে, সেক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী বৈষ্ণবগোষ্ঠী নরোত্তম দাস ঠাকুরের প্রভাবই সর্বাধিক।

তথ্যসূত্র নির্দেশিকা

১. শ্রীহরিদাস দাস (সংকলিত ও সম্পাদিত), শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৪২২, পৃ- ১২৬৮।

২. তদেব, পৃ- ১২৬৩- ১৩৬৭।

৩. তদেব, পৃ- ১২৬৮- ১২৭০।

৪. ঐ, শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন, অখণ্ড সং, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১৪২২, পৃ- ১৮৫-১৮৬।

৫. Ramakanta Chakraborty, Vaisnavism in Bengal, Sanskrit Pustak Bhandar, Calcutta, October 1985, pp-229-230

৬. শ্রীতারক ব্রহ্মদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রী গৌড়দেশে তিন আচার্য, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ, শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির, ইসকন মন্দির, মায়াপুর, নদিয়া, ২০১৫, পৃ- ৩৭২-৩৮৭।

৭. তদেব।

৮. রমাকান্ত চক্রবর্তী, বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬, ৫ম মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ-৮৮- ৮৯।

৯. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গ পরিজন, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৩৭৫, পৃ-৪২২- ৪৩২।

১০. নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ স্মারক গ্রন্থ, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা একত্রে, ২০০১-২০০২, নবদ্বীপ, নদিয়া, পৃ- ৪-৫।

১১. Ramakanta Chakraborty, op. cit, pp-237, 239- 240

১২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, মডান বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃ- ৩৩০-৩৩৪।

১৩. রমাকান্ত চক্রবর্তী, বাঙালির ধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতি, সুবর্ণরেখা পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০২, পৃ-৩৭-৩৯।

চব্বিশ পরগণা জেলার মিশ্র লৌকিক ধর্মসাধনাঃ একটি পর্যবেক্ষণ

মোফাজুর রহমান মোল্লা,
গবেষক, এম.ফিল,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

পশ্চিমবঙ্গের অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা জেলাটি ঐতিহাসিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে অন্য অঞ্চলের থেকে স্বতন্ত্র এবং বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে এক বৈচিত্রময় রূপ লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান চব্বিশ পরগণা জেলায় বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থা লক্ষ্যণীয় যে, এখানে হিন্দু, পৌন্ড্র নামে পরিচিত জনগোষ্ঠী, মুসলিম, খ্রিষ্টান ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস এবং তাদের জীবন প্রবাহ মিলে মিশে দিনে দিনে গড়ে তুলেছে এক মিশ্র সমাজ ও জনসংস্কৃতি। নিম্নগাঙ্গেয় এই অঞ্চলে মানুষের লৌকিক ধর্মসাধনাতে মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব এবং যার ফলস্বরূপ বেশ কিছু লৌকিক দেবদেবী, গাজী ও পীর পীরানী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর দ্বারা পূজিত হয়। এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য হল, অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা জেলাতে ভিন্ন জনগোষ্ঠী দ্বারা কীভাবে একই লৌকিক দেবদেবী বা পীর পীরানী পূজিত হচ্ছে এবং মানুষের এই সাধনার পশ্চাতে বিশেষ কোন কারণ বা উদ্দেশ্য রয়েছে কিনা তা অনুসন্ধান করা।

শব্দ সূচকঃ- চব্বিশ পরগণা জেলা, লৌকিক ধর্ম সাধনা, বন বিবি, ওলা বিবি, মানিক পীর, সত্য পীর

ভূতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, নৃবিজ্ঞান, লোকসংস্কৃতি, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতির আলোকে চব্বিশ পরগণা অঞ্চলটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যর দাবি রাখে। চব্বিশ পরগণা জেলার ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং নানাবিধ কারণের জন্য বর্তমান গবেষকদের কাছে এই জেলার ইতিহাস বিশেষভাবে আকর্ষনীয় করে তুলেছে। ঐতিহাসিক, ভৌগলিক এবং সাধারণ মানুষের জীবনধারা পটভূমিকায় চব্বিশ পরগণা তথা দক্ষিণ বঙ্গে গড়ে উঠেছে একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। আর এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যর প্রকাশ ঘটেছে এই অঞ্চলের লৌকিক দেবদেবীদের প্রতি বিশ্বাস ও ধর্মাচারের মধ্যে দিয়ে। বৈদিক-অবৈদিক, আর্য-অনার্য, শাস্ত্রীয় ও লৌকিক প্রভৃতি ভিন্নমুখী সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে এই জেলাটি বৈচিত্রময় রূপ ধারণ করেছে। মিশ্র সংস্কৃতির ঐতিহ্যমণ্ডিত মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় এই অঞ্চলের লৌকিক ধর্ম সাধনাতে। বর্তমান চব্বিশ পরগণা জেলায় বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থায় লক্ষ্যণীয় যেখানে হিন্দু, পৌন্ড্র নামে পরিচিত জনগোষ্ঠী, মুসলিম, খ্রিষ্টান ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস এবং তাদের জীবন প্রবাহ মিলেমিশে দিনে দিনে গড়ে তুলেছে এক মিশ্র সমাজ ও জনসংস্কৃতি। নিম্ন গাঙ্গেয় এই অঞ্চলে মানুষের লৌকিক ধর্ম সাধনাতে মিশ্রসংস্কৃতির প্রভাব এবং যার ফল স্বরূপ বেশ কিছু লৌকিক দেবদেবী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর দ্বারা পূজিত হচ্ছে। লৌকিক দেবতা বা লৌকিক সংস্কৃতির গুরুত্ব সম্পর্কে রাধা গোবিন্দ বসাক লিখছেন যত দিন না কেউ বাংলা অঞ্চলের লৌকিক দেবতাদের সম্পর্কে লিখছেন ততদিন পর্যন্ত বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাস অলিখিত থাকবে[১]। বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান বিষয় হল অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা জেলার ভিন্ন জনগোষ্ঠী দ্বারা কী

ভাবে একই লৌকিক দেব দেবী পূজিত বা সাধনা করা হচ্ছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের এই একই দেবতার সাধনার পশ্চাতে বিশেষ কোন কারণ বা উদ্দেশ্য কাজ করছে কিনা তা অনুসন্ধান করা।

চব্বিশ পরগণা লোক সমাজ মূলত গ্রামকেন্দ্রিক ও কৃষি ভিত্তিক এবং সাধারণ লোকজনকে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে হয়। কৃষি, জল এবং জঙ্গলের উপর নির্ভরশীলতার ফলে লোক সমাজের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্টিত হয় পাশাপাশি জল জঙ্গলের জীবনঘাতী জীবিকা অর্জনের সংগ্রামে একে অপরের নিত্যসঙ্গী ও সহমর্মী বলেই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেকেই একাত্মতা অনুভব করে। তাই এই জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে বর্তমানে লোকায়ত হিন্দু ও মুসলিম সমাজে লৌকিক দেবদেবী ও পীর পীরানী এবং বিবি-গাজীদের পূজা করা হয়। এই মিশ্র লৌকিক ধর্ম সাধনা বা ধর্ম সংস্কৃতি দক্ষিণবঙ্গ তথা পূর্ব ভারতীয় লোকসমাজের কাছে গৌরবজনক পরিচয় বহন করে চলেছে। এখানকার লোকায়ত সমাজ ও সংস্কৃতির বিষয়ে প্রণালীবদ্ধ আলোচনা ব্যপকভাবে না হওয়ায় বহু ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য উল্লেখ করেছেন লৌকিক দেবতাদের আলোচনা দ্বারা বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি মূল্যবান অধ্যায় রচনা করা যেতে পারে, কারণ বাংলার জাতিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব আলোচনার মূল্য অপরিসীম[২]। যদি ও চব্বিশ পরগণা জেলার লুপ্ত প্রায় ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি উদ্ধার করতে বিশেষ ভাবে কালিদাস দত্ত, রবীন্দ্র পুরষ্কারে সম্মানিত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর কথা উল্লেখ করতে হয়। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু তাঁর 'বাংলার লৌকিক দেবতা' গ্রন্থে চব্বিশ পরগণা সহ সমগ্র বাংলার লোকসংস্কৃতি উদ্ধারে করে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে[৩]। পরবর্তী সময়ে চব্বিশ পরগণা জেলার লোক ধর্মচর্চায় অনেকে এগিয়ে আসেন তাদের মধ্যে ধূর্জটি নস্কর[৪] ও ডঃদেবব্রত নস্কর[৫] এবং অন্যান্য গবেষকগণ লৌকিক জীবনচর্যার স্বাতন্ত্র্য ও মৌলকতা উদ্ধারে এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু তথাপি এই জেলার লৌকিক দেবদেবী, বিবি গাজী ও পীর পীরানীদের নিয়ে আর ও আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে কারণ এই জেলার লোক ধর্মে পরতে পরতে সাজানো আছে চব্বিশ পরগণা জেলার বহু অজানা ও লুপ্ত প্রায় ইতিহাস ও সংস্কৃতি। যাইহোক এই প্রবন্ধে দ্বারা আমরা অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা (উত্তর ও দক্ষিণ এবং ভারতের অধিকৃত সুন্দরবন অঞ্চলটি) নামক অঞ্চলটির মিশ্র লৌকিক ধর্মসাধনা এবং মিশ্র লৌকিক সাধনার পিছনে কারণকে অনুসন্ধান করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় আলোচনাটি দুটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে একটি অংশে কেমন ভাবে বর্তমানে মানুষ জন মিশ্র লৌকিক ধর্মসাধনা করছে এবং দ্বিতীয় অংশে মিশ্র সাধনার কারণ সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই জীবন স্রোতের যাত্রাপথে চলতে চলতে যতই জটিল পর্যায়ের উপস্থিত হয়েছে, প্রকৃতির নানান সজীব ও নির্জীব উপাদান গুলো মানুষের মনে ভয় ও বিস্ময় সৃষ্টি করেছে এবংযা থেকে জন্ম নিয়েছে নানান কাল্পনিক ধারণা, কুসংস্কার ও বিশ্বাসের। প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে বাতাকে তুষ্ট করতেহলেইত্যাদির হাত থেকে কিভাবেমুক্তি পাওয়া যায়, এই সকল তাদের বিশ্বাস থেকে সমাজে জন্ম হয়েছে প্রকৃতি পূজা। নিজেদের আত্মরক্ষার স্বার্থে মানুষ তৈরি করেছে বিভিন্ন দেবস্থান এবং পাশাপাশি জন্ম নিয়েছে আদি ভৌতিক বিষয় সহ বিভিন্ন টোটেমগত ধারণা।ভারতবর্ষ তথা বাংলার নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে আঞ্চলিক দেবদেবীর সমাবেশ ঘটেছে, আবার কখনো কখনো সাম্প্রদায়িক সীমারেখা ভেঙে নানা ধর্মের মানুষের দ্বারা পূজিত হয়ে থাকেন লৌকিক দেবীগণ। তাদের মধ্যে -

শীতলা, মনসা, ষষ্ঠী প্রভৃতি।লৌকিক দেবতার পূজা মূলত হিন্দু সম্প্রদায় করে থাকলেও বনবিবি, সত্যপীর, গাজী বাবা, মানিক পীর, মোবারক গাজী, প্রমুখ দেব দেবীদের পূজা আজও হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ করে থাকেন। এই অংশে দেখানো হল চব্বিশ পরগণা জেলার উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ কীভাবে বিভিন্ন লৌকিক দেবতার আরাধনা করছে তা দেখানোর চেষ্টা করা হল।

বনবিবি:

চব্বিশ পরগনা জেলার প্রান্তিক অঞ্চলে এবং বাংলাদেশের খুলনা জেলার জঙ্গলাকীর্ণ পল্লীতে বনবিবির পূজা হয়। তাঁকে ঘিরে ছড়া, গান শোনা যায়। বনবিবি নাম থেকে এ ধারণা করা যায় ইনি বনের অধিষ্ঠাত্রী। সুন্দরবনে যাতায়াতকারী হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাউল, মৌলে,মালঙ্গি, নৌজীবী, শিকারীরা বনের মধ্যে নিরাপদ থাকতে এবং তাদের যাত্রা শুভ করতে বিশ্বাস ভরে বনবিবিকে পূজা করে থাকেন। শশাঙ্ক শেখর দাস তার "বনবিবি" নামক গ্রন্থে লিখেছেন- আর্য সংস্কৃতি ও দেশীয় সংস্কৃতির মিশ্র রূপ এখানে যেমন লক্ষণীয়, তেমনি মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাবও এই ভাবনায় লক্ষ্য করা যায়। আদি পাঠান যুগে বনদেবী কিভাবে বিবিতে রূপান্তরিত লাভ করেছে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে[৬]। এবার আসা যাক দেবীর সাজ ও অলংকরণে মিশ্র সংস্কৃতির মেলবন্ধন কেমন ছিল সেই আলোচনায়। কোনো অঞ্চলের থানে বা মন্দিরে তাকে হিন্দু দেবীর ন্যায় শাড়ি ও নানা অলংকারে ভূষিত রমনী রূপে উপস্থাপন করা হয় লোকায়ত হিন্দু জনগোষ্ঠী সমূহের কাছে ইনি সর্বজন প্রিয় মাতৃমূর্তি।আবার কোথায় মুসলমান তন্নীর নেই জামা পরিহিতা। তবে তিনি সর্বদাই ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে উপবেশন করেন, এখানে তার কোলে থাকে এক "দুখে" নামে এক বালক যাকে তিনি বাঘের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং পাশে এক "শাজলঙ্গী" নামে মুসলিম যোদ্ধা যিনি বনবিবির ভাই। বিশেষত বাংলাপয়লা ও দুসরা মাঘদিনে বনবিবির পূজা উপলক্ষে মেলার আয়োজন করা হয়, যা নানা ধর্মের মানুষের মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়। গ্রাম বাংলার মেলাগুলিতে প্রাণ খোলা সতেজতা ও সরলতা, বর্তমানে এখানে কোন যান্ত্রিকতা নেই। লৌকিক দেবতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এক সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক উৎসব। পৌতলিক হিন্দুরা মায়ের আসনে বসিয়ে শত শত বছর ধরে এইবনদেবীর পূজা করে চলেছে থানে। মন্দিরে, চাষী গৃহস্থের পরিবারে অনেক স্থানে বসে আছেন বনবিবি কুলদেবীর আসনে, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভক্তজনের চিত্ত জয়কারী এমন লৌকিক দেবতা চব্বিশ পরগনায় অদ্বিতীয়। বনবিবি শুধু একজন অভিজাতি মুসলমানী নন, মুসলমান সমাজে এর পরিচয় হল একজন বিলাসিনী রমণী। বনবিবি যে একজন উচ্চকোটির আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন মহীয়সী মাতৃমূর্তি। আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পদের মুসলমান সাধিকা ও ইসলাম প্রচারক ছিলেন উনি পারিবারিক আভিজাত্যের নিজের সমাজে প্রথমে ছিলেন বহুজন পূজ্য এবং পরবর্তীকালে হিন্দু সমাজে উপাস্য হন। বনবিবির মন্দিরের তথাকথিত কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিত নেই, স্থানীয় কিছু ব্যক্তি ও মন্দির কমিটি মিলে কয়েকজন দেবীর পূজায় পৌরত্ব করেন, যেহেতু হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরী আরাধ্যা দেবী তাই এখানে একজন মুসলমান ব্যক্তিও থাকেন। দেবীর পূজায় কোন ভুল হয় না স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস দেবী মানুষের পাশাপাশি সকল জীবেরই প্রাণ রক্ষা ও হিতসাধন করে থাকেন।

ওলাবিবি :

ওলাইচন্ডী বাওলাবিবি বিভিন্ন নামে এই লৌকিক দেবীকে অভিহিত করা হয় এর পূর্ণ নাম ওলা-ওঠাচন্ডী বা ওলা-ওঠা বিবি। এই দেবী ওলা-ওঠা রোগের অধিক শান্তিদেবী, ভক্তরা এইদেবীকে পূজা করেন ওলা-ওঠা রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। ওলা-ওঠা চলতি দুটি গ্রাম্য শব্দের সমষ্টি যার অর্থ বমি হওয়া, যাকে ইংরেজিতে কলেরা বলা হয়। যেখানে পানীয় জলের সমস্যা, মানুষ যেখানে বিশুদ্ধ জল পান করার সুযোগ পায় না, সেক্ষেত্রে কলেরা রোগ ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। এই পরিস্থিতিতে যেখানে চিকিৎসার অভাব সেখানে মানুষ লোকদেবতাকে আশ্রয় করে প্রাণ বাঁচাতে চায়। এইরূপ লোকদেবতা ওলাবিবিহিন্দু প্রধান অঞ্চলে এর আকৃতি একেবারে লক্ষ্মী সরস্বতীর মত, আবার মুসলিম প্রধান অঞ্চলে এর আকৃতি বা পোশাক পরিচ্ছেদ একটু ভিন্ন রকমের হয়, যেখানে মূর্তি খানদানি ঘরের মুসলমান কিশোরীর মত পিরান, পাজামা, টুপি, ওড়না এবংগায়ে নানা রকম গয়না। যিনি হিন্দুদের নিকট ওলাইচণ্ডী নামে পূজিত হন। সুতরাং 'ওলা-বিবি' নামের মধ্যে মুসলিম মোড়ক থাকলেও ইনি হিন্দুদের ওলাইচণ্ডী। হিন্দু ও মুসলিম ওলাবিবিকে সে কারণে সমান শ্রদ্ধায় পূজা হাজত দেন ও এঁদের নিয়ে পালাগান আসরে শ্রবণ করেন। বহু স্থানে ইনি তার ছয় ভগ্নিদের সঙ্গে থাকেন যে কারণেই সাতবিবি নামে পরিচিত, কোন কোন গবেষক এই সাতবিবি সম্ভবত শাস্ত্রীয় সপ্তম মাতৃকারসাথে একইবলে অভিহিত করেছেন, সম্ভবত এই দেবীর পূজার উৎপত্তি কেন্দ্র চব্বিশ পরগনা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার পাশাপাশি হাওড়া নদীয়া বাঁকুড়া বীরভূম বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় পুজিত করা হয়, এমনকি কলকাতা বিভিন্ন স্থানে এই দেবীর থান ও মন্দির মন্দির লক্ষ্য করা যায়।

সত্যনারায়ণ – সত্যপীর :

সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর পূজার্চনা উপাসনা ভারতের বিভিন্ন অংশে বহু হিন্দু ও মুসলিম ধর্মালম্বীদের মধ্যে প্রচলিত আছে বহু শতাব্দী ধরে। বাংলা, বিহার, উড়িয়া প্রদেশের প্রায় সর্বত্র এবং পাঞ্জাবের জলন্ধর ও দাক্ষিণাত্যের মহীশূর অঞ্চলে এর প্রাধান্য লক্ষিত হয়।জানা যায় মহাভারতে সত্যনারায়ণের অনুরূপ দেবতা "সত্যবিনায়ক" এবং স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে "সত্যনারায়ণ" দেবতার উল্লেখ কিছু কিছু আছে। বাংলার মুসলমান সমাজের উপাস্য হিসাবে সত্যপীর কিভাবে স্থান পেয়েছে তা অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলা যায় সত্যনারায়ণের অনুরূপ দেবতা 'সত্যদেব"[৭]। হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রচলিত ছিল পরে ভারতে মুসলমান অধিকারের পর সে পূজার্চনা পল্লীর ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজের লোকরা, জন্মগত বা বংশগত সংস্কারের প্রভাবে গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁরা, অত্যধিক নিষ্ঠাবান মোল্লা-মৌলভির আপত্তির বা বিরক্তির আশংকায় সত্যনারায়ণের 'নারায়ণ' পরিবর্তে 'পীর' শব্দ যুক্ত করে সত্যপীর নামে আপন করে গৃহের মঙ্গলের জন্য শিরনি দেয় তারা সত্যপিরকে ধূপ-বাতি-ক্ষীর হাজত দিয়ে গৃহের মঙ্গল কামনা করেন। সত্যনারায়ণ এর প্রতীক স্বস্তিক চিহ্নটি হিন্দুত্বের প্রতীক, আবার শিরনি দিয়ে হাজত করা মুসলমানরীতি বলে বিবেচিত হয়।এ সকল দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে একটা ধারণা স্পট - সত্যনারায়ণ ও সত্যপীর আদিও যাই থাকুন বর্তমানে গত কয়েক শতাব্দী বা মধ্যযুগ হতে হিন্দু ও মুসলমানদের একটি সমন্বিত দেবতা।

মানিকপীর:

মানিকপীর হলেন একজন মুসলিম সাধক। মানিক পীর গো রক্ষক দেবতার রূপে চাষী হিন্দু গৃহস্থ পরিবারে পূজিত হয়, মানিক পীরের ব্যক্তিগত পরিচয় অন্যান্য পীর গাজী বিবিদের মতো রহস্যবৃত্ত। ভক্তদের বিশ্বাসএইপীর অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন কোন হেকিমি চিকিৎসক ও সাধক। গৃহপালিত পশু পক্ষীর রোগ নিরাময় কারী ছিলেন একসময় শ্রদ্ধা ভক্তির তা বললে লৌকিক দেবতার উন্নতি হয়েছে। চক্ষুরোগগত অসুখ হলে মানিকপিরের নিকট মানত করে ছলন দিয়ে বাদ্যি বাজনা সহ মানত চুকোয়, ধূপবাতি জ্বালে। গরুর বাচ্চা হলে পর প্রথম দোয়া দুধ মানিকপীত্রের নামে ক্ষীর দিয়ে বা পূজা স্থলে দিয়ে তবেই পরিবারের লোকজন খায়। মানিকপীর পালাগান আসরে গীত হয় এবং হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বসে শোনে।মানিক পীরের মূর্তি খুবই কম দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার প্রতীক সমাধি রূপে ছোট ছোট কাঁচা মাটি থেকে সর্বত্র দৃশ্যমান অনেকে মনে করেন মানিকপীর মানুষের কল্যাণ করে গবাদি পশুর রোগ মুক্তি ঘটান এবং প্রধান বৃদ্ধিতে সহায়তা করেন জয়নগর থানা সরিষা দেওয়া আছে মানিক পীরের বিখ্যাত মাজার রয়েছে। চব্বিশ পরগনা, খুলনা, হুগলি, নদিয়া প্রভৃতি জেলার মানিকপীরের থান ও মন্দির দেখা যায়, তবে প্রথমোক্ত জেলা চব্বিশ পরগনা বৃহৎ অঞ্চলের এই দেবতার প্রাধান্য রয়েছে[৮]।

রক্তা খাগাজি :

বাংলার ধর্মসমন্বয়ী দেবতার মধ্যে রক্তানগাজি অন্যতম। রক্তবর্ণ পঞ্চানন্দ বাংলায় ইসলামি করণের সময় রক্তানগাজি নামে হাজত পূজা পেয়েছেন। রক্ত আমাশয়, মায়েদের অতিরিক্ত রক্তস্রাব সম্পর্কিত রোগ এই দেবতার কৃপায় আরোগ্য লাভ হয় বলে লোকবিশ্বাস। দক্ষিণ ভারতের রক্তকাটেরি দেবতার সাথে রক্তানগাজির লোকসংস্কৃতিগত মিল আছে। যেখানে পানীয় জলের সমস্যা, জলবাহিত রোগ আন্ত্রিকের প্রকোপ, অথচ চিকিৎসার সুব্যবস্থা নেই, সেক্ষেত্রে রক্তানগাজি, রক্তবর্ণ পঞ্চানন্দ, রক্তকাটেরির মতো লোকদেবতাকে পূজা হাজত দিয়ে মানুষ নিষ্কৃতি প্রার্থনা করে। রক্তানগাজি সম্পর্কিত পালাগানের আসরে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ উপস্থিত থাকে। ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে বড় খাগাজী হলো বহু প্রচলিত এবং বহু আলোচিত। ইসলামের দৃষ্টিতে গাজী শব্দের অর্থ তারাই যারা বিধর্মীর সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী, তিনি গাজী নামে সম্মানিত হন। রায়মঙ্গল কাব্যে দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে বড় খাগাজীর প্রচন্ড সংঘর্ষ হয় এবং পরে সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপনের কথা উল্লেখ রয়েছে। বড় খাগাজীর উপাসকদের মধ্যে ধর্মীয় কোন ভেদাভেদ নেই, তিনি হিন্দু মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে সমানভাবে পূজনীয়। দক্ষিণবঙ্গের প্রান্তীয় অঞ্চলগুলিতে এই বীরপুরুষোচিত সাধকের মূর্তি সর্বত্র পুজা করা হয়।এছাড়াও ঘুটিয়ারি শরীফের পীর মোবারক গাজী ও তাতাল গাজী হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে সমান ভাবে উপাস্য হন।

প্রবন্ধের অন্য অংশের উপর দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে, হিন্দুরা বহু দেবতা মূর্তি গড়ে ও প্রতীকি পূজা করতে পারে কারণ তাদের কোন শাস্ত্রীয় বাধা নেই। কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনের ক্ষেত্রে এই বাধা লক্ষ্যণীয় যেখানে তারা এক আল্লাহর ব্যতীত অন্য কাউকে উপাসনা করতে পারেনা। পাশাপাশি

কোন মুসলিম প্রাণী কে পূজা করা অথবা মুসলিমদের অন্য মূর্তি পূজা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখছি বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীকে এই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ তারা সাধনা করছে এবং তাদের উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন মন্দির, মাজার, থান, দরগা ইত্যাদি নির্মাণ করছে এবংএই সকল লৌকিক দেবদেবীর আরাধনা করছে। তাহলে মুসলিমদের মধ্যে একটা বৈপরীত্য দেখা দিচ্ছে, অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন মুসলিম সাধকদেরকে দেবতার আসনে স্থান দিচ্ছে এবং তাদের উদ্দেশ্য পূজা দিচ্ছে। যদিও নিম্ন শ্রেণীর আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনও লৌকিক দেবতাকে উপাসনা করছে। এখানে আমরা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করব কেন হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষজন এই সমস্ত দেবদেবী বা পীর-পীরাণীদের সাধনা করছে। বর্তমান সময়ে মানুষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি ঘঠছে কিন্তু এই সকল লৌকিক আরাধনার কোন কমতি লক্ষ্য করা যায় নি, অথচ বিভিন্ন সময়ে এই সকল দেবদেবী বা পীর পীরানীদের কে কেন্দ্র করে আরাধনা ও নানা উৎসব পালন করা হচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের জনসমাজের দ্বারা লৌকিক দেবদেবীর আরাধনা এবং বর্তমান সময়ে সেই সংস্কৃতি বিরাজমান হওয়ার পশ্চাতে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য রয়েছে কী তা খোঁজ করা।

লৌকিক দেবতার প্রাথমিক ভাবে উদ্ভব ঘটেছিল ঐতিহ্যগত ধ্রুপদী যুগের পুরাণের বাইরের জগত থেকে। মানব সভ্যতার একেবারে গোড়ায় ভয়-ভীতি থেকে মানুষ অলৌকিক শক্তির অধিকারী দেবতা ও অপদেবতার কল্পনা করেছিল লৌকিক দেবতা গুলির জন্ম যতটা না অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তি থেকে তার চেয়ে বেশি আদি ভৌতিক ও আদি দৈবিক পীরা অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার তাগিদে এবং লোকসমাজের ইহকেন্দ্রিক মন নিজস্ব প্রয়োজনেএদের নির্মাণ করেছে। দেবতার কাছে তাদের প্রার্থনার প্রকৃতি দেখলে বোঝা যায় কতটা ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে এইসব ধর্ম বিশ্বাস জড়িত। সাধরণত বিপদ থেকে রক্ষা ধন-সম্পত্তি লাভ, সন্তান লাভ, হারানো দ্রব্যের প্রাপ্তির আশায়, বাঘ, সাপ, বসন্ত, কলেরা থেকে প্রাণ রক্ষার জন্য দেবতাদের স্মরণ করা হয়। যদিও সব সময় শাস্ত্রীয় বিধি ও বিধান মতে এদের অর্চনা হয়েছে তা নয়, স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস আর বহুকালগত লোকাচার এইসব দেবদেবীর পূজা অর্চনা করা হয়। এখানকার মানুষের জীবন জীবিকা ভূপ্রকৃতি আর প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই ধরনের কয়েকটি লৌকিক দেবতা বর্তমান সময়ে ও সহবস্থান করছে।

এই অঞ্চলের লৌকিক দেবদেবীদের উত্থানের পিছনে ভয় ভীতি বিশেষভাবে কাজ করেছিল। যদি আমরা এই লৌকিক দেবদেবীগুলির সাধনার কারণ গুলি লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যায়,সাধারণত মানুষজন বনবিবিকে সাধনা করেন কারণ তিনি বিভিন্ন রোগ-শোকের প্রতিকারে বা বাঘের ভীতি থেকে মানুষকে মুক্তি দেন, ওলাবিবি বা ওলাইচণ্ডী পূজিত হয় ও লাউটা বা কলেরা রোগ থেকে মুক্তি লাভের আশায়। মানিক পীর সাধারণভাবে গোসম্পদ বা পশু সম্পদ রক্ষাকারী দেবতা। গ্রামে গোমরক দেখা দিলে মানিক পীরের সেবক ফকিরগণ গরুর রোগ নিরাময়ের জন্য গাছগাছরার টোটকা দিয়ে থাকেন তাই হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষজন এই গোমরক থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানিকপীরকে আরাধনা করে। বোঝা যায় কৃষিজীবী সভ্যতায় কৃষি সহ গরুর রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান হয়েছিল কৃষক সমাজ এবং তাদের ভাবনায় উদিত হয়েছিল এরকম কাল্পনিক এক দেবতার কথা। আরেকটি পীরের নাম জানা যায় তিনি হলেন তাতাল গাজী খুবই বেশি পরিচিত নন গরু বাছুরের গায়ে এক প্রকার কীট

বাস করে। জীবন্ত পশুর রক্ত এদের খাদ্য এবং এর নাম বাটুলি। বাটুল রোগের ফলে রোগাক্রান্ত পশুটি রক্ত শূন্যতায় মারা যায়। এই সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্থানীয় কৃষকরা তাতাল গাজীর মাজারে তেল কিংবা জল রেখে প্রণাম করে তুলে নেয় তারপর সেই তেল বা জল গরুর সারা শরীরে মাখিয়ে দেয়, লোকবিশ্বাস এতে গবাদি পশু রোগ মুক্ত হবে। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন কৃষিজীবি অরণ্যবাসী অষ্ট্রিতে কৌম ও তাহাদের বংশধরগণ প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে বা অন্য কোন পার্থিব বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য শক্তিশালী লৌকিক দেবদেবীর পরিকল্পনা ওপূজা করত[৯]।

লোকায়ত সমাজে এইসব লৌকিক দেবতাদের আবির্ভাব ঘটেছিল বোধহয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে অথবা অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে যখন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে প্রখর ধর্মবিদ্বেষ বর্জন করে পারস্পরিক সম্প্রীতির পথ ধরে চলার চেষ্টা করেছিল এবং এই সম্প্রীতি দেখা দিয়েছিল অভাবী দূর্গত সাধারণ স্তরের হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে। তাদের চারিদিকে তখন রোগ, অভাব, নানা দায়িত্ব এবংবাস্তব জীবনে দিশাহারা, এই সমস্ত মানুষ সংকট থেকে পরিত্রান পেতে এই সকল দেবতার পরিকল্পনা করেছিল। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো দক্ষিণবঙ্গের মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেই আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় যেসব যোদ্ধা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছিল, তারাই পরবর্তীকালে গাজী রূপে অভিহিত হন। ইসলামী সংস্কৃতির প্রসারে এইসব গাজীরা ক্রমশ দেবকল্প চরিত্রে উন্নতি হয় এবং জনসম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তির লাভের সামর্থ্য হয়।এই সব গাজী বা পীর পীরানীদের মাজার গুলিতে হিন্দু ও মুসলমানরা ভক্তি বা আরাধনার জন্য সমবেত হয়। সত্যনারায়ণ তথা সত্য পীরের মাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্য লিখেছেন হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। আজও দুই ধর্মের অনুসারীরা তাদের সাংসারিক শান্তি মঙ্গল সন্তান-সন্ততিদের ভালো কামনায় ও জীবিকার কুশল কামনার্থে সারম্ভে সত্যপীর, বনবিবি, গাজিবাবা দরগায় সিন্নি ও পূজা দেয়। বর্তমানের সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধির বিশৃঙখল অরাজকতার দক্ষিণবঙ্গের এই সম্প্রীতিমূলক ধর্মাচার গোড়া ধর্মান্ধ জননেতাদের সঠিক পথের দিশা নির্দেশ করতে পারে।

নিম্নবর্গের বা অনুন্নত শ্রেণী হিন্দুরা উন্নত বা উচ্চকোটি সমাজে অবহেলা পেতে থাকে এমনকি হিন্দু শাস্ত্রীয় দেবতার পূঁজাঅর্চন অধিকার ছিলনা, ফলে লৌকিক দেবতা বা লোকায়ত ধর্ম ব্যতীত তাদের উপাস্য বা ধর্মচার বলে কিছু ছিল না। এই সময় এই দেশে পীর-গাজীদের উদার বা শ্রেণি ভেদাভেদহীন ধর্ম প্রচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন এবং মুসলিম ধর্মের প্রতি কিছু কিছু আকৃষ্ট হন। মুসলমান ধর্ম গ্রহণ না করলেও পীর গাজীদের উদার ধর্মমতের প্রতি আকৃষ্ট হন। হিন্দু-মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলন এবং সদভাব ও প্রীতির ভিত্তিতে এইসব লৌকিক তথা কাল্পনিক দেবদেবতা পীরপীরাণীদের উৎপত্তি ঘটেছে। অন্যদিকে হিন্দু থেকে মুসলিম বা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর ও নব মুসলমানগণ তাদের বংশ পরম্পরায় অর্জিত হিন্দু সংস্কার তৎক্ষণাৎ পূর্ণমাত্রায় পরিত্যাগ করা সম্ভব হয়নি। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর ও তাঁরা আল্লার উপর ভরসা করে নির্লিপ্ত থাকতে পারলেন না এবং পূর্বের ধর্মের সংস্কার সংস্কৃতি আঁকড়ে রাখতে ও সঙ্কুচিত হলেন। এই অবস্থায় হিন্দু ও ইসলামিক সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে নিলেন[১০]। তাদের এই মিশ্র সংস্কৃতি স্ব-ধর্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিল এবং পরবর্তী সময়ে সেই সংস্কৃতি বিসর্জন করা সম্ভব পর হয়নি।

ভারতে মুসলমান অধিকারের পর হিন্দুরা স্বধর্ম রক্ষার ব্যাপারে শঙ্কিত হলেও মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব কিছু কিছু হিন্দু সমাজে বিস্তার লাভ করেছিল। পল্লীবাসী শান্তি প্রিয় সাধারণ বা নিম্নবিত্ত সমাজের মানুষজন তারা এটা উপলব্ধি করেছিল একই দেশে বা পল্লীতে বংশ পরম্পরা থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাবে রাখা বা সংঘাতে লাভবান হওয়া সম্ভব নয়। মানুষজন আরও বুঝেছিলেন ধর্মের দিক থেকে পার্থক্য থাকার সে মিলন বাঁধার সৃষ্টি হয়ে থাকে, এক্ষেত্রে স্বধর্ম ত্যাগ না করে ধর্ম ব্যাপারে একটি সমন্বিত মতবাদ গ্রহণ করলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরুদ্ধভাব লোভ পেতে পারে। গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু লিখছেন ধর্মীয় সমন্বয়ের ব্যাপারে একটি বৈজ্ঞানিক কারণ দেখানো যেতে পারে, তার মতে সমাজতত্ত্ব থেকে জানা যায় যখন দুটি ভিন্ন বা স্বতন্ত্রী মানব সম্প্রদায় বাধর্মালম্বী প্রথম সংস্পর্শে আসে যে সময় উভয়ের মধ্যে বিরুদ্ধে ভাব দেখা দেয়, কিন্তু দীর্ঘকাল একত্র বা সমপর্যায়ে থাকার ফলে তাদের মধ্যে আবার আচরণ চিন্তাভাবনা ও অপারাপর সাংস্কৃতি দিক একটা সমন্বয় নিজ হতে গড়ে ওঠে। তাই এই ধারণা করা যায় বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যনারায়ণ ও সত্যপীর বনদেবী থেকে বনবিবি, গাজী বাবা পূজা উপাসনার মধ্যে সমন্বয়ের সৃষ্টি হয়েছে[১১]।

এই সকল দেবদেবী বিশ্বাস বা সাধনার ক্ষেত্রে ভূ-প্রাকৃতিক অধিবাসীদের জীবিকাও জীবনযাত্রার মান যেমন প্রভাব বিস্তার করেছে তেমনি বসবাসকারী মানুষের নৃতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক বিশিষ্টতা এবং সক্রিয়তাও ভূমিকা নিয়েছে। পৃথিবীর কোন অঞ্চল বোধ হয় আজ আর বাকি ভূখণ্ড থেকে নিজেকে স্বতন্ত্রভাবে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি এবং সেই স্থানের আদিবাসীদের কারণে সংস্কৃতির জগতে মিশ্রণ ঘটছে, চব্বিশ পরগনায় দেখা গিয়েছে দীর্ঘদিন ধরে অস্ট্রিক জাতির মানুষ বসবাস করে আসছে। পাশাপাশি রয়েছে হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, মাহিষ্য তেমনি রয়েছে চন্ডাল, কৈবর্ত, প্রত্যন্ত সীমাতে বহিরাগতদের উপনিবেশ হয়েছে। পূর্ববঙ্গের খুলনা, যশোর, বাকরগঞ্জ জেলার নমশূদ্ররা এসে আশ্রয় নিয়ে সুন্দরবন সন্নিহিত গোসাবা, বাসন্তী, হিঙ্গলগঞ্জ, বসিরহাট, বারাসাত ইত্যাদি অঞ্চলে বাসস্থান গড়ে তুলেছে। পাশাপাশি জঙ্গল হাসিলের সুবাদে এসেছিল ইত্যাদি নিম্ন শ্রেণীর আদিবাসী সম্প্রদায়। এই সকল জন গোষ্ঠী নিজেদের সহবস্থানের জন্য একটি মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। চব্বিশ পরগনা জেলাটি দক্ষিণ প্রান্তে গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলের অন্তর্গত প্রশাসনিক কারণে জেলাটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় অখন্ড জেলাটির দক্ষিনে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে হুগলি নদী, উত্তরে নদীয়া জেলা ও পূর্বে বাংলাদেশের খুলনা জেলা আছে। এই জেলার দক্ষিণের বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে সুন্দরবন তাছাড়া চতুর্থাংশ নদী নালা সমাকীর্ণ, এরকম ভৌগলিক পরিবেশ বিশেষ ভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করে লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠতে[১২]। জল, জঙ্গল ও প্রাকৃতিক বিপদ থেকে মুক্তিলাভের আশায় এই সব দেবতাদের উৎপত্তি ঘটে। এম. অমৃতালিঙ্গম মনে করেন পবিত্র বনাঞ্চল গুলি এই সকল লৌকিক দেবদেবীর স্থান। স্থানীয় লোকেরা বিশ্বাস করে যদি এই পবিত্র জঙ্গলে ক্ষতি করা হয় তাহলে এই সকল দেবতার থেকে বিপদ ডেকে আনা সেই কারণে লৌকিক দেবদেবীরা জঙ্গালাকীর্ণ অঞ্চল গুলিতে প্রাধান্য পেয়েছে[১৩]।

চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে লৌকিক দেবদেবীর বিভিন্ন দেবদেবী গাজী পীর-পিরানীদের প্রভাব অনুভব করা যায়। লৌকিক ধর্মের পরতে পরতে সাজানো আছে এঁদের মাহাত্ম্যর কথা। সাধারণ কৃষিজীবি ও শ্রমজীবী মানুষ জীবন জীবিকার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন লৌকিক দেবতাগণ, শুধুমাত্র ধর্মাচারণ

ও আনন্দ-বিনোদন নয় বহু মানুষ শিল্পীরা মূর্তি করে, পট শিল্পী পরিবেশন করে জীবনের ব্যবহারিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছে। শেষাংশে বলা যেতে পারে সময়ের সাথে সাথে চব্বিশ পরগনা জেলার পরিবেশ পরিকাঠামো পরিবর্তিত হলেও লোকায়ত সংস্কৃতি প্রধান সুরটি কিন্তু আজও একই রয়ে গিয়েছে এবং আরো নানা বৈচিত্রের মধ্যে দিয়ে এই লৌকিক সাধনা ও সংস্কৃতি বাংলা তথা বিশ্ব রঙ্গমঞ্চকে একটি আলাদা সংস্কৃতির পরিচয় গড়ে তুলেছে। বর্তমান সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতির কাছে এই লোকসংস্কৃতি দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যেখানে কতগুলো জনগোষ্ঠী নিজেদের তাগিদে স্বধর্ম ত্যাগ না করে সহাবস্থান ভাবে বিরাজ করছে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বহন করে চলেছে যা বাংলা তথা পূর্ব ভারতীয় সমাজের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈচিত্র্য।

তথ্যসূত্র নির্দেশিকা

১. উদ্ধৃত, ডঃ মনীন্দ্রনাথ জানা, সুন্দরবনের সমাজ ও সংস্কৃতি, প্রথম সংকলন, কলিকাতা, দীপালী বুক হাউস, ১৯৪৪, পৃ- ১১৩।

২. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রথম সংকলন, কলিকাতা, কলিকাতা বুকহাউস, ১৯৪০, পৃ- ১১।

৩. গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা,প্রথম দেজ সংকলন,কলিকাতা, দেজ পাবলিশিং, ১৯৭৮।

৪. ধূর্জটি নস্কর, 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী-বিবিগাজী-পীরপীরানী ও লোকসমাজ', দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ (পশ্চিমবঙ্গ সরকার), ২০০০, কলকাতা, পৃ-২০৫- ২৫।

৫. ডঃ দেবব্রত নস্কর, চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবীঃ পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা, প্রথম সংকলন, কলিকাতা, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, ১৯৯৯। সুন্দরবন সভ্যতা ও লোকসংস্কৃতি অন্বেষণ, প্রথম সংকলন, কলিকাতা, দেজ পাবলিশিং, ২০১৭।

৬. শশাঙ্ক শেখর দাস, বনবিবিঃ সুন্দরবনের লোকজ কিংবদন্তি, কলকাতা, ২০০৪, পৃ- ৪২।

৭. ডঃ দেবব্রত নস্কর, চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবীঃ পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা, পৃ- ৪৬৫-৭৮।

৮. সুফী মতাদর্শের প্রভাব অঞ্চল গুলিতে সমানভাবে কাজ করেছিল এবং সেজন্য পীরদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ডঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস, বাংলা পীরসাহিত্যর কথা, প্রথম সংকলন, বারাসাত, শেহিদ লাইব্রেরী, ১৯৬০, পৃ- ৪১২।

৯. উদ্ধৃত, ডঃ মনীন্দ্রনাথ জানা, পূর্বোক্ত, পৃ-১১৩-১৪।

১০. ডঃ দেবব্রত নস্কর, সুন্দরবন সভ্যতা ও লোকসংস্কৃতি অন্বেষণ, পৃ- ৮৮।

১১. গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, পূর্বোক্ত, পৃ- ২১৭।

১২. সনৎ কুমার নস্কর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার লোকসাংস্কৃতিক ভূগোল, গোকুলচন্দ্র দাস (সম্পাদিত), চব্বিশ পরগণার আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৯, কলকাতা, পৃ- ২৩২-২৫৪।

১৩. অমৃত লিঙ্গম মুরাগশ্বিন, 'Folk deities associated with the scared groves of India', সি. পি. আর এনভাইরোমেন্টাল এডুকেশানসেন্ট্রি, খন্ড-২০, ভাগ-২, তামিলনাড়ু, ২০১৪, পৃঃ-১৪-১৬।

মহেশখালির আদিনাথ মন্দির: ইতিহাস ও ঐতিহ্য

মুহাম্মদ ইসহাক
সহকারী অধ্যাপক
রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

বঙ্গোপসাগরের বুকে জেগে ওঠা দ্বীপটি হল মহেশখালি।বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায় মহেশখালি অবস্থিত। চারদিকে সমুদ্রবেষ্টিত পাহাড়ি দ্বীপের নামই মহেশখালি। আধুনিক বিশ্বে মহেশখালি নানান কারণে দেশ-বিদেশে বেশ পরিচিত জায়গা। মহেশখালি অবস্থানগত কারণে ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। পাহাড় শোভিত ও মনোমুগ্ধকর মহেশখালিতে মৈনাকপর্বত বা আদিনাথ অবস্থিত। আদিনাথ মন্দিরের রয়েছে এক ঐতিহাসিক পটভূমি।আদিনাথ পাহাড়ে রয়েছে ইতিহাস খ্যাত আদিনাথ মন্দির। মহেশখালির ইতিহাসের সাথে আদিনাথ মন্দিরের ইতিহাস জড়িত। মহেশখালির নামকরণ নিয়ে নানা মতভেদ প্রচলিত রয়েছে। এ দ্বীপের নামকরণে প্রচলিত রয়েছে পৌরাণিক কাহিনি, জনশ্রুতি ও নানান কিংবদন্তি। একদা মহেশখালির আদি নাম ছিল "আদিনাথ - মহেশখালি।" চট্টগ্রামের ইতিহাসের সাথে কক্সবাজারের ইতিহাস জড়িত। সনাতন ধর্মের তীর্থ ও পূণ্য স্থান আদিনাথ। তবে দ্বীপটির পুরনো সাংস্কৃতিক স্মারকচিহ্নের নিদর্শন হচ্ছে আদিনাথ মন্দির। মহেশখালির আদিনাথ মন্দির সম্পর্কে পৌরাণিক ও নানান লোককাহিনী প্রচলিত আছে। আদিনাথকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর আদিনাথ মেলা ও ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।আদিনাথ শিব মন্দিরের বার্ষিক মেলায় বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রের সমাবেশ ঘটে। আদিনাথ মন্দির পরিদর্শন করার জন্য দেশ -বিদেশ হতে প্রতি বছর বহু পর্যটক মহেশখালিতে ভ্রমণ করে। এ প্রবন্ধে আদিনাথ মন্দিরের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে।

শব্দ সূচক: মৈনাক, আদিনাথ মন্দির, মহেশখালি, পৌরাণিক, ঐতিহ্য

বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হলো মহেশখালি। এটি নানান কারণে দেশ-বিদেশে বেশ পরিচিত। এটি পর্যটন নগরী কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত। কয়েক বছর পূর্বেও মহেশখালির সাথে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল নৌপথ। এখন স্থলপথে যাবার সুযোগ রয়েছে। মহেশখালির মিষ্টিপান ও সোনাদিয়ার শুঁটকী দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশেও সুনাম রয়েছে। এ দ্বীপে সমুদ্রের পানি থেকে লবণ উৎপাদন হয়। মৎস্য সম্পদ ও কৃষি সম্পদের ভরপুর একটি জায়গা। মহেশখালিতে রয়েছে ঐতিহ্য ও ইতিহাসখ্যাত আদিনাথ মন্দির। যা মৈনাক পর্বত/মৈনাক পাহাড় নামে পরিচিত। মহেশখালি দ্বীপের নামকরণ নিয়ে নানান জনশ্রুতি ও মতভেদ প্রচলিত রয়েছে। এ প্রবন্ধে আদিনাথ মন্দিরের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রবন্ধের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রধানত মাধ্যমিক উৎস

থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে আদিনাথ মন্দির সম্পর্কে পৌরাণিক ও লোককাহিনী প্রচলিত রয়েছে। "চট্টগ্রাম শহরের দক্ষিণে একটি বাঁকিয়ে পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরে দ্বীপে মৈনাক পর্বতে আদিনাথ শিব।[১]

মহেশখালিতে মৈনাক পাহাড়ে আদিনাথ মন্দির অবস্থিত। "চট্টগ্রামের মহেশখালীর নদী ও বঙ্গোপসাগরের মোহনায় নিকটস্থ দ্বীপে কথিত মৈনাক পাহাড়ের উপর আদিনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। সমতল ভূমি হতে ঊনসত্তরটি সোপান অতিক্রম করে মৈনাকের শীর্ষদেশে আদিনাথের মন্দিরে যাওয়া যায়। এটি একটি শিব মন্দির।"[২]

স্কটল্যান্ডের নাগরিক ড. ফ্রান্সিস বুখানন ১৭৯৮ সালে মহেশখালিতে ভ্রমণ করেন। তিনি ১৭৯৮ সালে ৩০ শে মার্চ হতে ২ রা এপ্রিল মোট চারদিন মহেশখালিতে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি এ সময়ে মহেশখালির গোরকঘাটা হয়ে আদিনাথ পাহাড়ে গিয়েছিলেন। তিনি ১৭৯৮ সালের ৩১ শে মার্চ মহেশখালির ভ্রমণে উল্লেখ করেন, "বিকেল বেলা প্রণালী দেখতে দেখতে আমি পাহাড়ে ঘুরলাম। এই প্রণালীর মাধ্যমে মহাদেশ থেকে এই দ্বীপ বিচ্ছিন্ন। গভীর গিরিখাতের মাধ্যমে পশ্চিমের পাহাড় থেকে এটি বিচ্ছিন্ন হয়েছে; তবে এর শীর্ষভাগে যেটুকু জায়গা আছে, তার ওপর দিয়ে দু'জন লোক চলতে পারে এবং দক্ষিণ দিককার শেষপ্রান্তে হিন্দুদের একটা মন্দির আছে, যেখানে পুণ্যার্থীদের বেশ আসা-যাওয়া ঘটে। এবং ওখান থেকে মহেশখালি এবং অপরপ্রান্তের দৃশ্য বেশ মনোহর। এই মন্দিরে যাবার দুরারোহ পথের মাটি অত্যন্ত ভালো, কিন্তু কোথাও কোথাও শিলার মতো স্তরও রয়েছে। হালকাভাবে এসব স্তরের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন স্থানে গাছের শেকড় বাকড়ের গ্রন্থিও দেখা যায়; কিন্তু কোথাও কোথাও ওগুলো শক্ত হয়ে পাথরের মতো হয়ে গেছে।"[৩] বহুবছর পূর্বে মহাকবি কালিদাস রচিত 'কুমার সম্ভবের' প্রথম অধ্যায়ে মৈনাক পর্বতের উল্লেখ রয়েছে। আর এ মৈনাক পর্বত হল মহেশখালি দ্বীপ। মহাকবি কালিদাস ও বাল্মীকির লেখা থেকে বলা যায় মহেশখালি দ্বীপে জনবসতি বা মানববসতি বহু বছর আগে থেকে ছিল। কালিদাস শক্তি-উপাসক ছিলেন। তাঁর নিজ নামই কালিদাস। অনেকে মনে করেন, কবি কালিদাস প্রাগৃজ্যোতিষপুর (কামরূপ) বাসী ছিলেন। কালিদাস তাঁর কাব্যগ্রন্থে সুক্ষ দেশ, মৈনাক পর্বত, রামগিরি, দেবগিরি ও চর্ম্মন্বতী প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন।[৪] আদিনাথ পাহাড়ের পাহাড়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। মৈনাক পাহাড় বা মহেশখালির চতুর্দিকে চকরিয়া, কুতুবদিয়া দ্বীপ, কক্সবাজার জেলা ও বঙ্গোপসাগর। এই স্থানের অবস্থানগত কারণে এর রয়েছে অনিন্দ্য সুন্দর পটভূমি।[৫] চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা তত্ত্বনিধি প্রণীত, চট্টগ্রামের ইতিহাস গ্রন্থে বলেন, 'মহেশখালিকে আরাকানী ভাষায় 'মাহাজো' বলে থাকে। ইহা অতি পুরাতন দ্বীপ এবং কুতুবদিয়া হতে অনেক বড় ও লোক সংখ্যাও অধিক। তথাকার পর্বত শ্রেণিকে মৈনাক ও আদিনাথ বলে।'[৬] চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র তত্ত্বনিধি প্রণীত 'চট্টগ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, মৈনাক হল হিমালয়ের শাখা। হিমালয়ের এক শাখা আসাম, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম হয়ে ক্রমে দক্ষিণ পূর্বাভিমুখে বিস্তৃত। যা চট্টগ্রামের দক্ষিণ পশ্চিমদিকস্থ মহেশখালি দ্বীপে একটি শাখা উঠেছে। আর ইহা লবণ সমুদ্রস্থিত মৈনাক পর্বত। মহেশখালির এই মৈনাক পর্বতেই আদিনাথ শিব চিরপ্রসিদ্ধ।[৭]

চারদিকে সমুদ্রবেষ্টিত ও প্রাকৃতিক সম্পদের ভরপুর একটি জায়গা হলো মহেশখালি। বর্তমানে হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হল মৈনাক বা আদিনাথ। অনেকেই অনুমান করেন যে,বর্তমান নিম্নবঙ্গ যখন বঙ্গসাগরের তখন এই পূর্ব্ব সাগরস্থ মৈনাক (মহেশখালির আয়তন ভেঙ্গে গিয়ে মৈনাক পর্বত অংশ ক্ষুদ্র অবস্থায় আছে)। মহেশখালির উপর দিয়ে পূর্ব সাগর তীরস্থ উপরোক্ত পূর্ব্বদেশাদিতে যাতায়াত করত। হনুমান ও সেইরূপ পশ্চিম দেশ হতে প্রথমত:এ মৈনাকে উপস্থিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বাল্মীকি রচিত আদি মহাকাব্য রামায়ণের কবি সুন্দরকাণ্ড ১ম পর্বের ৮৭ ও ৯৬ নং শ্লোকে উল্লেখ করেছেন,

"তস্মিন প্লবগশার্দ্দুলে প্লাবমানে হনূমতি।
ইক্ষ্বকুকুলমানার্থী চিন্তায়মাস সাগর:।।"
"হিরণ্যগর্ভো মৈনাকো নিশম্য লবণাম্ভসঃ
উৎপপাত জলাত্তূর্ণং মহাদ্রুমলতাবৃতঃ।"[৮]

মহেশখালির নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন জনশ্রুতি, কিংবদন্তি,লোককাহিনী ও লোককথা প্রচলিত রয়েছে। এক্ষেত্রে আদিনাথ মন্দির ও গোরকঘাটা ঘাটের নাথধর্মের প্রভাব রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। "গোরক্ষনাথের কোনো শিষ্য তাঁর গুরুর নামে মহেশখালীর 'গোরক্ষঘাট' নামকরণ করতেও পারেন।"[৯] তবে বর্তমানে মহেশখালিতে গোরকঘাটা নামে একটি ঘাট ও ঘাটকে কেন্দ্র করে একটি গোরকঘাটা বাজারও রয়েছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড.সলিমুল্লাহ খান তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন, "ইহার (মহেশখালি) ঘাটের নাম ছিল 'গোরক্ষনাথের ঘাট'-অপভ্রংশে 'গোরকঘাটা'। মহেশখালি একদা নাথধর্মের প্রান্ত স্পর্শ করিয়া থাকিবে। নহিলে ইহার নাম শিবের নামে হয় কি করিয়া। ইহাতেই প্রমাণ হাজার বছর আগেও এ দ্বীপে মানুষের বসবাস ছিল।"[১০] সাহিত্য বিশারদ আবদুল করিম তাঁর 'ইসলামাবাদ' গ্রন্থে বলেন, "পৃথিবীর চারিটী মহাধর্মশক্তি এখানে এসে মিলিত হয়েছে। ইহা হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ এই তিন মহাজাতির একটা পরম পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত। সীতাকুণ্ড তীর্থ স্থান পরিচিত। শিব চতুর্দশী সময় এতে ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে লক্ষ লক্ষ ভক্ত হিন্দু পুরাণের নরনারীর সমাগম হয়ে থাকে। এই শহরের উত্তরাংশে পুরাণের চট্টেশরী পীঠ বর্তমান। মহেশখালি দ্বীপের আদিনাথও হিন্দুদের একটি পবিত্র তীর্থ।"[১১] মহেশখালির আদিনাথ ও মহেশখালির নামকরণের বিষয়ে ইতিহাসবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন। ড. সুনীতিভূষণ কানুনগো তাঁর 'A History of Chittagong' বইয়ে লিখেছেন, "The second important center of saivism in the district is the Shrine of Adinath, situated in the Island of Moheshkhali. The origin of the name of Adinath can be examined in the tantrick work. Dr. Muhammad Shahidullah is not far from the truth to say that the Adibudha of the Buddhist Tantrick works was transformed into Adinath (Adi-first, the first of the Nathas) in the Natha cult.Adinath may also be identified with Adideva or Mohadideva of the Tantras. Mohanirvanatuntra Adinath is stated as the first guru."[১২] একদা 'মহেশখালির আদি নাম ছিল আদিনাথ - মহেশখালি।'[১৩]

ইতিহাসবিদ ড. সুনীতিভূষণ কানুনগো তাঁর চট্টগ্রামের প্রাচীন গ্রন্থে বলেন, "নাথ মতাবলম্বীরা বিশ্বাস করে যে,আদিনাথ বা আদিবুদ্ধ তাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। আদিনাথের প্রথম এবং পূজাস্থল হল মহেশ (মহেশখালি) দ্বীপ। এই দ্বীপের পর্বত শীর্ষে তাঁর প্রতি ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ আদিনাথ মন্দির নির্মিত হয়েছে। উত্তর চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ এবং দক্ষিণ চট্টগ্রামের আদিনাথ নাথ ধর্মের প্রধান দেবতা হিসেবে পূজিত হন।"[১৪] বাংলাদেশে স্থাপত্যকলার ইতিহাসে মহেশখালির আদিনাথ মন্দিরের তাৎপর্য রয়েছে। "পনের ও ষোল শতকে বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে-বিপ্লবের সৃষ্টি হয়, তার ফলে বাংলা একটি স্বতন্ত্র আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়ে ওঠে। ফলে তৎকালীন বাংলার শিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপত্য শিল্পের স্বকীয়তার নিদর্শন অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এ ধারাবাহিকতার অনুপম নিদর্শন মহেশখালির আদিনাথ মন্দির।"[১৫] নাথ ধর্মের প্রবর্তক হলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য হলেন গোরক্ষনাথ। মৎস্যেন্দ্রনাথের নিকট থেকে যোগ সাধনা শিক্ষা করেন গোরক্ষনাথ। তাঁর উত্তরাধিকারী হন। গোরক্ষনাথ ভারতের নানান জায়গায় নাথধর্ম প্রচার করেন। তবে ভারতের উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলা ও মহেশখালী দ্বীপের গোরখঘাটা গ্রাম তাঁকে স্বরণীয় করে রেখেছে।[১৬]

"শৈব ও বৌদ্ধ ধর্মীয় দর্শনের দীর্ঘমেয়াদী বিবর্তনের একটি অন্যতম ফলশ্রুতি নাথদর্শন। শৈব ও বৌদ্ধ দর্শনের ক্রমবিবর্তনের এক পর্যায়ে আবির্ভূত হয় তন্ত্রশাস্ত্র। আর এটাই আদিনাথ (মতান্তরে মৎসেন্দ্রনাথ বা মীননাথ) প্রবর্তিত নাথধর্ম।"[১৬] লোককথা ও প্রবাদ আছে যে, 'রাবন রাজা তপস্যা করিয়া মহাদেশকে স্বদেশ নিবার সময়ে তাঁহার প্রসাবের পীড়া হওয়ায় পথিমধ্যে তাঁহাকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া মৈনাক পর্বতে প্রসাব করিতে বসেন, পরে প্রসাব করিয়া আসিয়া আর তাঁহাকে উঠাইতে না পারিয়া বিফল মনোরথ হইয়া স্বদেশ ফিরিয়া যান। মুত্রখালী নামক একটি ক্ষুদ্র ছড়াও তথায় বিদ্যমান আছে।'[১৭] বর্তমান মহেশখালিতে মুদির ছড়া নামে একটি স্থান রয়েছে। এই মুত্রখালী পরিবর্তিত হয়ে 'মুতের ছড়া' বা মুতাছাড়া নামে পরিচিত লাভ করে। মহেশখালির নামকরণের নিয়ে নানান মতভেদ ও লোককথা প্রচলিত রয়েছে। অনেকের মতে, "শিব এর অপর নাম গণেশ ও মহেষ। 'শিব' এর অপর নাম 'মহেশ' এর নামানুসারে মহেশখালি নামকরণ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেকর্ড পত্রে দ্বীপের নামের লিখা হয়েছে মইশখাল (Moiscal)। আবার অনেকে মনে করেন স্থানীয়ভাবে 'মহিশ' কে মুইশ বলা হয়। এক সময় দ্বীপের বনাঞ্চলে 'বন্য মুইশ' থাকত। সে কারণে দ্বীপের নামকরণ 'মুইশখালী' হয়েছে। 'মুইশখালী' আধুনিক হয়ে মহেষখালি বা মহেশখালি হয়েছে।"[১৮] তবে ইতিহাসবিদ সুনীতিভূষণ কানুনগো বলেন, "ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিক ও লেখকরা 'মহেশখালি' কে ''Mexal' দ্বীপ বর্ণনা করেছেন। এই Mexal শব্দটা ক্রমান্বয়ে Moiscal বা Mohes Island বা Moheskhali Island হয়েছে।"[১৯]

মহেশখালিতে বহুবছর ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। হিন্দু, মুসলিম, রাখাইন, মগ ও বৌদ্ধ সহ নানান ধর্মের লোকজন রয়েছে। নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে ঐতিহ্যের মিল-বন্ধনে অটুট রয়েছে। সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতি সবাই পালন করে আসছে। ঐতিহাসিক আদিনাথ মন্দির সম্পর্কে মহেশখালির স্থানীয় জমিদার নুর মোহাম্মদ সিকদার তাঁর একটি দুগ্ধবতী গাভীকে নিয়ে একটি লোককাহিনী প্রচলিত রয়েছে।[২০] বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী, লোককাহিনী, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা ও মতভেদের প্রেক্ষিতে মহেশখালির নামকরণ ও আদিনাথ মন্দিরে ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

মহেশখালিতে আদিনাথ মন্দির রয়েছে। এর পেছনের দীর্ঘ প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, "মন্দিরটির নাম আদিনাথ (নাথ ধর্ম প্রচারকদের অগ্রণী) মন্দির এবং অদূরেই গোরক্ষঘাট নামে একটি স্থান আজও রয়েছে (গোরক্ষনাথও নাথ ধর্মের প্রচারক)। সুতরাং মৈনাক পাহাড়ের উপর আদিনাথ মন্দির একটি 'নাথ মন্দির' বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।"[২১] আদিনাথ ও শিব সম্পর্কে পুরাণ ও নাথপন্থীদের কাহিনিতে একটি সাধারণ কাঠামো হিসেবে কাল পরম্পরায় এই পর্যন্ত এসেছে। অন্যদিকে বৌদ্ধ ধর্ম থেকে উৎপত্তি লাভ করে হিন্দু ধর্মে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে নাথপন্থা আদিনাথ কাহিনি ও ইতিহাসকে যৌক্তিক কাঠামো যুগিয়েছ।[২২]

বর্তমান মহেশখালিতে ধর্ম,বর্ণ ও গোত্র মিলেমিশে গত কয়েকশত বছর ধরে শান্তিতে জীবনযাপন করছে। "শিবের ১০৮টি নামের মধ্যে আদিনাম-আদিনাথ, তাঁর নামে মন্দির। শিবের প্রতীক শিবলিঙ্গ রয়েছে আদিনাথ মন্দিরে। অষ্টভূজার মন্দির রয়েছে শ্বেতপাথরে ছোট অষ্টভূজার মন্দির। পূর্বে যা নেপাল রাজ দরবারে ছিল। মূল মন্দির প্রায় ৫০০ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়।"[২৩] অধ্যাপক রতনলাল চক্রবর্তী তাঁর 'বাংলাদেশের মন্দির' বইয়ে লিখেছেন, "স্থানীয় ভাবে জানা যায় যে মহেশখালীর জমিদার প্রভাবতী ঠাকুরাণী আদিনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।"[২৪] বনমালী ঘোষ তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন, "শ্রী শ্রী আদিনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেবতা দেবাদিদেব মহাদেবের নামানুসারে। বাংলাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে কক্সবাজার জেলার মহেশখালীর বঙ্গোপসাগর ঘেষা মৈনাক পর্বতের উঁচু চূড়ায় মনোরম পরিবেশে আদিনাথ শিব মন্দির, তীর্থ মন্দিরটির অবস্থান। আদিনাথের অপর নাম মহেশ। এই মহেশের নাম অনুসারে মহেশখালী।"[২৫] সনাতন ধর্মের নানান গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, "আদিনাথের গোড়াপত্তন কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে ত্রেতাযুগে।"[২৬] মহেশখালির স্থানীয় জমিদার নূর মোহাম্মদ শিকদার ও একটি দুগ্ধবতী গাভীকে জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে। যা বিভিন্ন লেখায় ফুটে উঠেছে। "এক নাগা সন্ন্যাসীর সহায়তায় নেপাল থেকে পাথরের অষ্টভূজা দূর্গা মূতি আনয়ন করে আদিনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মহেশখালির স্থানীয় জমিদার নুর মোহাম্মদ শিকদার,রামুর জমিদার প্রভাবতী দেবী এবং নেপালের রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় ও আর্থিক সহায়তায় মন্দিরটি নির্মাণ করতে সমর্থ হন।"[২৭] তবে মহেশখালির আদিনাথে প্রতিবছর মেলা হয়। যা আদিনাথ শিব মন্দিরে বার্ষিক মেলা হিসেবে খ্যাত। যেখানে সনাতনধর্মের লোকজন ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মের মানুষ মেলায় অংশগ্রহণ করে। "বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও ভারতীয় উপমহাদেশের হাজার হাজার তীর্থযাত্রী পূণ্য অর্জনের জন্য প্রতিনিয়ত যাতায়াত করে পূণ্য সঞ্চয় করে থাকেন। প্রত্যেক বৎসর ফাল্গুনের শিব চর্তুদ্দর্শী তিথীতেও লক্ষ লক্ষ পূণ্যার্থী এসে পূণ্য সঞ্চয় করে যান।এই শিব চর্তুদ্দর্শী মেলা পক্ষ কালব্যাপী স্থায়িত্ব হয়ে থাকে। উপমহাদেশের সকল স্থান থেকে সকল সম্প্রদায়ের ভীড়ে লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠে মিলন মেলা ও তীর্থ ক্ষেত্র।"[২৮] বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও সখ্যতা গড়ে ওঠে এর মাধ্যম। আদিনাথ মেলায় নানান অঞ্চল থেকে দর্শনার্থীরা অংশগ্রহণ করার ফলে স্থানীয় সংস্কৃতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে স্থানীয় বা আঞ্চলিক ইতিহাস। স্থানীয় ইতিহাস সমাজের ও দেশের ইতিহাসচর্চায় ভূমিকা রাখে। আঞ্চলিক ইতিহাসের ভিত্তি হিসেবে মহেশখালির আদিনাথ মন্দিরের ইতিহাস মহেশখালির নামকরণ, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

তথ্য সূত্র নির্দেশিকা

১. চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা তত্ত্বনিধি প্রণীত, *'চট্টগ্রামের ইতিহাস,'* কমল চৌধুরী (সংগ্রহ ও সম্পদনা), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৬, পৃ- ১২৯।

২. রতনলাল চক্রবর্তী, *বাংলাদেশের মন্দির,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ- ৪৫।

৩. ভেলাম ভান সেন্দেল সম্পাদিত, অনুবাদ : সালাহ উদ্দিন আউয়ুব, *দক্ষিণ- পূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন (১৭৯৮): কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামে তাঁর ভ্রমণ,* প্রকাশক: ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, রুম- ১১০৭, কলা ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ- ৭৪- ৭৫। দেখুন, *Francis Buchanan in South East Bengal (1798): His Journey to Chittagong,the Chittagong hill tracts, Noakhali and Comilla,* UPL Dhaka, 2018, p. 46.

৪. কমল চৌধুরী (সংগ্রহ ও সম্পদনা), *পূর্বোল্লিখিত,* পৃ- ১৬৪- ১৬৫।

৫. মুহাম্মদ আব্দুল বাতেন, *মহেশখালীর আদিনাথ মন্দিরের ইতিকথা,* বলাকা, চট্টগ্রাম, ২০১১, পৃ- ১৮।

৬. চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা তত্ত্বনিধি প্রণীত, *চট্টগ্রামের ইতিহাস,* গতিধারা, ২য় প্রকাশ, ২০১১, পৃ- ৮৭।

৭. চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা প্রণীত, *পূর্বোল্লিখিত,* পৃ- ২১০।

৮. চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা প্রণীত, *পূর্বোল্লিখিত,* পৃ- ২১১।

৯. মুহাম্মদ আব্দুল বাতেন, *পূর্বোল্লিখিত,* পৃ- ২৫।

১০. সলিমুল্লাহ খান, 'বিষণ্ন মহেশখালি', সাদাত উল্লাহ খান ও শাওয়াল খান (সম্পাদিত), *মহেশখালি : উন্নয়ন, নীতি ও নিয়তি,* প্রতিবুদ্ধিজীবী, ঢাকা, ২০১৯, পৃ- ১৪- ১৫।

১১. আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ, *ইসলামাবাদ,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ- ২১- ২২।

১২. Dr.Suniti Bhushen Qanungo, *A History of Chittagong -Vol.1,* Chittagong, 1988, p. 101-102.

১৩. সলিমুল্লাহ খান, *পূর্বোল্লিখিত,* পৃ- ১৪।

১৪. ড.সুনীতিভূষণ কানুনগো, *চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস,* বাতিঘর, চট্টগ্রাম, ২০১৯, পৃ- ৪৪।

১৫. মুহাম্মদ আব্দুল বাতেন, *পূর্বোল্লিখিত,* পৃ- ৩৩।

১৬. ড.সুনীতিভূষণ কানুনগো, *পূর্বোল্লিখিত,* পৃ- ৪৪- ৪৫।

১৭. মুহাম্মদ আব্দুল বাতেন, *পূর্বোল্লিখিত,* পৃ- ২৫।

১৮. চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা তত্ত্বনিধি প্রণীত, *পূর্বোল্লিখিত,* পৃ- ৮৭।

১৯. মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, 'পুরাকীর্তি ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহ', *কক্সবাজারের ইতিহাস,* কক্সবাজার ফাউন্ডেশন, ১৯৯০,পৃ- ২৮৯- ২৯০।

২০. Dr. Suniti Bhushen Qanungo, *ibid*, p. 92

২১. বিস্তারিত দেখুন,অধ্যাপক নুর আহমদ, *কক্সবাজারের ইতিহাস,* ১৯৮৮, পৃ. ২২২-২২৭। দেখুন, মুহাম্মদ আব্দুল বাতেন, *পূর্বোল্লিখিত,* পৃ- ২২- ২৪।

২২. মুহাম্মদ আব্দুল বাতেন, *পূর্বোল্লিখিত,* পৃ- ৩৮।

২৩. সরওয়ার কামাল, 'মহেশখালির ইতিহাস: পুরাণ, মানে ও বাস্তবতা', *দীপ: স্মারকগ্রন্থ,* মহেশখালী পেশাজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড, চট্টগ্রাম, ২০২১, পৃ- ৬৩।

২৪. অধ্যাপক নূর আহমদ, *কক্সবাজারের ইতিহাস,* ১৯৮৮, পৃ-২২২- ২২৭।

২৫. রতনলাল চক্রবর্তী, *পূর্বোল্লিখিত,* পৃ- ৪৫।

২৬. বনমালী ঘোষ, 'শ্রী শ্রী আদিনাথ মন্দির ঐতিহাসিক পটভূমি', *মাটির মায়া: গুণীজন সংবর্ধনা স্মারক, ২০০৮,* মহেশখালি সমিতি, চট্টগ্রাম, পৃ- ৩১- ৩৩।

২৭. *মহেশখালী: মোহনীয় দ্বীপ,* উপজেলা প্রশাসন, মহেশখালী, নভেম্বর ২০২১,পৃ.৩২-৩৪। বনমালী ঘোষ, *পূর্বোল্লিখিত,* পৃ. ৩১ মুহাম্মদ আব্দুল বাতেন, *পূর্বোল্লিখিত,* পৃ- ২৩।

২৮. মুহাম্মদ আব্দুল বাতেন, *পূর্বোল্লিখিত,* পৃ-২২। অধ্যাপক নূর আহমদ, *পূর্বোল্লিখিত,* পৃ- ২২২- ২২৭।

২৯. বনমালী ঘোষ,*পূর্বোল্লিখিত,* পৃ- ৩৩।

ছিটমহলঃ পূর্বভারতের ব্যাতিক্রমী এক অধ্যায়

সুবিনয় দাস
শিক্ষক, খাপসাডাঙ্গা হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

'ছিটমহল' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Enclave' -এর অর্থ এরূপ- " A portion of territory surrounded by a larger territory whose inhabitants are culturally or ethnically distinct." আবার 'Enclave' এর পাশাপাশি 'Exclave' বলেও একটি শব্দ পাওয়া যায়, যার অর্থ হল –" A portion of territory of one state completely surrounded by territory of another or others as viewed by the home territory"এক্ষেত্রে দেখা যায় ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহল অর্থাৎ "বাহ্যস্থান" গুলির ক্ষেত্রে 'Enclave'-এর সংজ্ঞাটি মানায় না। ছিটমহল শব্দটি ঠিক প্রথম কবে থেকে ব্যবহার হচ্ছে তাও সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা যায় না। মুঘল যুগে এই 'বাহ্যস্থান' বা ছিটমহল গুলির উদ্ভব হলেও তখন এগুলো ছিল চাকলার অধীনস্থ। চাকলা বলতে বোঝায় ' কতিপয় পরগণার সমষ্টি; আর চাকলাদার বলতে, ইজারাদার মূলত মুসলমান আমলে প্রাপ্ত হিন্দুর উপাধি বিশেষ।[১] ভারতীয় 'বাহ্যস্থান' গুলির উৎপত্তি, বিবর্তন, এর স্বরূপ ও মূল ভূখণ্ডে বিলীন হয়ে যাওয়ার কথাই এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। আলোচনার বোধগম্যতার জন্য আমরা প্রবন্ধে এই 'বাহ্যস্থান' গুলোকে 'ছিটমহল' হিসাবেই আলোচনা করবো। তবে এগুলির নাম 'ছিটমহল' নাকি 'বাহ্যস্থান' বলা সঠিক, তা কিন্তু আলোচনার দাবি রাখে।

ছিটমহল শুধু ভারত বাংলাদেশের মধ্যেই আছে তা নয়, বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও ছিটমহল বা 'Enclave' রয়েছে তবে উপমহাদেশের ছিটমহল গুলো বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে খানিকটা ভিন্ন। উদাহরন হিসাবে বলা যায়, লেসেথো যা দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে অবস্থিত। সান মেরিনো ও ভ্যাটিকান সিটি যা ইতালিতে অবস্থিত। আবার কিছু "Exclave"এর উদাহরন হল, ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পণ্ডিচেরি ছিল ফ্রান্সের বাহ্যস্থান আর ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ বাহ্যস্থান ছিল পূর্ব-পাকিস্তান।[২]

ভারত বাংলাদেশের ছিটমহলের দিকে লক্ষ্য রেখে আন্তর্জাতিক ছিটমহলের সংজ্ঞা দেওয়া কষ্ট সাপেক্ষ। ছিটমহল বা তার প্রতিশব্দ Enclave বলতে বোঝায় কোন একটি নির্দিষ্ট স্বাধীন স্থান অন্য আরেকটি দেশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। যেমন, দক্ষিণ আফ্রিকায় লেসেথো ও ইতালিতে সান ম্যারিনো এবং ভ্যাটিকান সিটি। আবার অন্য কোন দেশের বিচ্ছিন্ন কিছু অংশ যদি অপর আরেকটি দেশে অবস্থিত হয় তাহলে অপর দেশটির কাছে সেটি ছিটমহল আর স্বদেশের কাছে তা বাহ্যস্থান নামে পরিচিত। যেমন, বাংলাদেশের বাহ্যস্থান তথা ভারতের ছিটমহল ছিল ৫১ টি আবার অন্যদিকে দেখা যায় ভারতের বাহ্যস্থান তথা বাংলাদেশের ছিটমহল ছিল ১১১ টি। দেশের অভ্যন্তরেই আবার এক প্রদেশের কিছু অংশ অন্য প্রদেশে বাহ্যস্থান হতে পারে। যেমন, আসামের তিনটি বাহ্যস্থান পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলায় রয়েছে আর কোচবিহারের একটি আসামে রয়েছে। ছিটমহল হওয়ার অনিবার্য শর্ত হল উদ্দিষ্ট স্থানটি একটি অপর সার্বভৌম রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত হতে হবে, তা দুটি রাষ্ট্রের সীমান্তে থাকলে সেটি বাহ্যস্থান হলেও ছিটমহল হবে না এমনকি সেই স্থানটির পাশে সমুদ্র থাকলেও তা ছিটমহল হওয়ার বৈশিষ্ট্য হারাবে।

ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহলের উৎসকথা

ছিটমহলের সৃষ্টির কথা জানতে হলে ব্রিটিশ আমল পেড়িয়ে মুঘল যুগে ফিরে যেতে হবে। বর্তমানে ছিটমহল গুলি যেসব স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন সময়ে সেই স্থান গুলির ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে কখনো বা কোচবিহার রাজা ও মুঘল সম্রাটের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে আবার কখনো বা প্রায় অর্ধ-স্বাধীন মুঘল অধীনস্থ বাংলার নবাবের সাথে কোচবিহার রাজার সম্পর্কের ভিত্তিতে। মুঘল ও কোচবিহার রাজার মধ্যে যে সবসময় সদ্ভাব ছিল তা কিন্তু নয়, সম্পর্কের অবনতিও হয়েছে অনেক সময়। কোচবিহার রাজ নরনারায়নের সঙ্গে মুঘল সম্রাট আকবরের ১৫৭৬ সালে সুসম্পর্ক স্থাপন ও উপহার বিনিময়, মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের আমলে তার ভগিনী প্রভাবতীর দেবীর সাথে অম্বর রাজ মানসিংহের শুভ পরিনয়(১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি কোচবিহার ও দিল্লীর সদ্ভাবেরই ইঙ্গিত বহন করে।[৩] কিন্তু উভয় শক্তির সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে কোচবিহার রাজ প্রাণনারায়নের আমলে (১৬২৫-৬৫ খ্রিঃ)। তাঁর রাজত্ব কালের শেষের দিকে মুঘল দরবারে সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে শুরু হয়েছিল এক চরম রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব। তৎকালীন সময়ে বঙ্গদেশের সুবাদার শাহজাহানের কনিষ্ঠ পুত্র শাহসুজাও ভ্রাতৃযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে বাংলার শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে পরে। মুঘলদের এরকম দুর্বলতার সুযোগে ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহার রাজ প্রাণনারায়ণ ও পরে অহমরাজ জয়ধ্বজ সিংহ নিম্ন আসাম আক্রমন করে দখল করে নেন। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রাননারায়ন ঢাকা দখল করে লুঠ করেন। পূর্ব ভারতে অবস্থার অবনতি দেখে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে জয়ী ঔরঙজেব ১৬৬১ সালেই সেনাপতি মিরজুমলাকে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রেরন করেন। ১৪ই ডিসেম্বর মিরজুমলা কোচবিহার রাজ্যে প্রবেশ করে, কোচবিহার রাজ খবর পেয়ে ১৬ই ডিসেম্বর ভূটান পর্বতের কাঁঠালগুড়িতে পালিয়ে যান। ১৯শে ডিসেম্বর মিরজুমলা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোচবিহারের রাজধানী দখল করে। তবে কোচবিহারে মিরজুমলার আক্রমনের তারিখ নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে একাধিক মাটির প্রাকার বা আল দেখা যায়। যেগুলো আবার বাঁধ হিসাবেও কাজ করেছিল। 'ভীমের জাঙ্গাল' এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণও 'গোঁহাই কমল আইল' তৈরি করে বিখ্যাত হয়ে আছেন। 'আলমগিরনামা' ও 'তারিখে আসাম' গ্রন্থেও এরকম এক বাঁধ বা আইলের কথা উল্লেখ আছে। কোচবিহার রাজ্যের রাজধানী থেকে এই আইলের ভিতরের অংশকে বলা হত 'ভিতর বন্দ' আর আইলের বাইরে কোচবিহার রাজ্যের যে অংশ ছিল তাকে বলা হত 'বাহার বন্দ'। ভিতরবন্দে ছিল ১২ টি পরগনা আর বাহারবন্দে ছিল পাঁচটি চাকলায় ৭৭ টি পরগনা।

মিরজুমলা কোচবিহারের নাম আলমগির নগর প্রদান করেন এবং এর দায়িত্ব ইস্ফেন্দিয়ার বেগ-এর হাতে দিয়ে আসাম অভিযানে প্রস্থান করেন। অত্যাচারী ইস্ফেন্দিয়ার জনগনের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে সদলবলে ঘোড়াঘাটে আশ্রয় নেয়।[৪] বিতাড়নের কারন হিসাবে মুঘল প্রশাসন কর্তৃক জাবত বা জাবতি নামক নতুন পদ্ধতিতে রাজস্ব আদায়ের কথাও বলা হয়।[৫] বিতারিত ইস্ফেন্দিয়ারকে সাহায্য করার জন্য আসাম থেকে আসগর খাঁ এগিয়ে আসেন, কিন্তু তিনি কোচবিহারের রাজধানীতে প্রবেশ করতে না

পেরে বাহিরবন্দের ফতেপুর চাকলা ছাড়া আর কিছু দখল করতে পারেন নি। পরবর্তীতে ১৬৮৭ সালে ঘোড়াঘাটের ফৌজদার এবাদত খাঁ কোচবিহার আক্রমন করে কাকিনা চাকলা দখল করে নিয়েছিল।

চাকলা গুলো সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কোচবিহারের মহারাজা রূপনারায়নের (১৬৯৩-১৭১৪ খ্রিঃ) আমলে। ইতিমধ্যেই ফতেপুর ও কাকিনা চাকলা মুঘল অধীনস্থ ছিল, ফলে বাংলার সুবেদার চাকলা গুলির উপর রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করে। রূপনারায়ন উত্তরাধিকার সূত্রেই রংপুরের ফৌজদারের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পরেছিল। চাকলা গুলোতে রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টাও যুদ্ধের এক কারণ ছিল। অপর দিকে ঘোড়া ঘাটের ফৌজদারও একই কারণে কোচবিহারের মহারাজের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেন। যুদ্ধরত উভয় পক্ষই ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে দুর্বল হয়ে পরে ফলে ১৭১১ খ্রিঃ মহারাজা রূপনারায়ন ও মুঘল সর্দার আলিকুলি খাঁ-র মধ্যে এক সন্ধি দ্বারা স্থির হয় যে বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বভাগ চাকলা তিনটি কোচবিহারের রাজার অধিনে থাকবে আর কাকিনা, ফতেপুর ও কারজিরহাট চাকলা তিনটি থাকবে মুঘলদের অধিনে। ঢাকার সমসাময়িক নায়েব নাজিম সিলাহদার খান এমনকি মুঘল কতৃপক্ষও এই সন্ধি মেনে নেন নি। ১৭১১ সালেই আলিকুলি খা-কে সরিয়ে দিয়ে তাঁর স্থলে নিয়ামাতুল্লা খানকে নতুন নায়েব করে পাঠান হয়, যিনি এই পদে ১৭১৩ সাল পর্যন্ত ছিলেন। তিনি বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বভাগ তিনটি চাকলার উপর রাজস্ব দাবি করেন। ফলে পুনরায় কোচবিহারের সঙ্গে মুঘল শক্তির যুদ্ধ শুরু হয় এবং কোচবিহার রাজ পরাজিত হলে উল্লেখিত চাকলা তিনটি বাদশাহের হস্তগত হয়। ১৭১২ খ্রিঃ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের মৃত্যু হয়, সিংহাসনে বসেন ফারুকসিয়ার। নতুন বাদশাহ নতুন নাজিম খান জাহান খানের চেষ্টায় কোচবিহারের সঙ্গে পুনরায় সন্ধি স্থাপন করা হয় তবে সন্ধিপত্রের ভাষা একটু পরিবর্তন করে। ঠিক হয় কোচবিহারের মহারাজা ছত্রনাজির শান্তনারায়নের নামে বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বভাগ চাকলা তিনটির ইজারা লাভ করবেন আর কাকিনা, ফতেপুর ও কারজিরহাট চাকলা তিনটি মুঘলদের অধিনেই থাকবে।[৬]

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়েছে যে, ছিটমহলগুলি যে চাকলাগুলিতে স্থিত সেগুলির মধ্যে কাকিনা, ফতেপুর ও কারজিরহাট ছিল মুঘল অধিনে আর বোদা, পাটগ্রাম, পূর্বভাগ ছিল ইজারা স্বরূপ কোচবিহারের অধীনে। রূপনারায়নের পরবর্তী শাসক ছিলেন মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ন (১৭১৩-৬৩খ্রিঃ)। তাঁর দত্তক পুত্র দীননারায়ন সিংহাসনের লোভে মহারাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং এতে তিনি সাহায্য পান রংপুরের ফৌজদার সৈয়দ আহমেদের। ফলে পুনরায় কোচ-মুঘল যুদ্ধ শুরু হয়, যুদ্ধে উপেন্দ্রনারায়ন পরাজিত ও রাজ্য হস্তচ্যুত হলে তিনি সাহায্যের জন্য ভূটান রাজের শরণাপন্ন হন। ভুটিয়া সহায়তায় উপেন্দ্রনারায়ন ১৭৩৭ সালে ধলুয়াবাড়ির নিকটে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে দীননারায়ন ও তাঁর সহযোগী মুঘল ফৌজদারকে চরমভাবে পরাজিত করেন। কোচবিহারের সাথে মুঘল প্রাদেশিক শক্তির এই ছিল শেষ যুদ্ধ, এরপর আর কোনরকম যুদ্ধ সংগঠিত হয় নি। তবে কোচবিহার রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে মুঘল সেনারা কিছু কিছু এলাকা নিজ দখলে রেখে বসবাস করতে থাকে। এই এলাকাগুলির আনুগত্য ছিল বাংলার নবাবের প্রতি, নির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে মুঘল অধীনস্থ চাকলা কাকিনা, ফতেপুর ও কারজিরহাটের চৌধুরীদের প্রতি। মুঘল সেনার দ্বারা অধিকৃত

এই খণ্ড খণ্ড গ্রামগুলি যা *'মোগলান'* নামে পরিচিত লাভ করে, এগুলিই সময়ান্তরে মুঘল শাসন অধীনস্থ রংপুর, পরবর্তীতে পূর্ব-পাকিস্তান এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের 'ছিটমহল'-এ পরিনত হয়।

তবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটমহল গুলি কিভাবে সৃষ্টি হল? তার কারন কিন্তু অন্য। কোচবিহারের মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ন মুঘল প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন ভুটানের সাহায্যে। উপেন্দ্রনারায়নের পর রাজসিংহাসনে বসেন তাঁর নাবালক পুত্র দেবেন্দ্রনারায়ন (১৭৬৩-১৭৬৫ খ্রিঃ)। নাবালক মহারাজ ষড়যন্ত্রের শিকার হন ও প্রাণ হারান। এরপর সিংহাসনে বসেন মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ন (১৭৬৫-৮৩ খ্রিঃ), আভ্যন্তরীণ গোলযোগের অভিযোগে তিনি ভূটান কর্তৃক অপহৃত হন। অপহৃত রাজাকে উদ্ধারের জন্য ছত্রনাজির খগেন্দ্রনারায়ন, সর্বানন্দ গোস্বামী ও কাশীনাথ লাহিড়ী পারস্পারিক আলোচনার পর সাহায্যের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শরণাপন্ন হন। ভূটানে হস্তক্ষেপের সুযোগ পেয়ে কোম্পানি সাহায্য প্রদানে রাজী হয়ে যায়, ১৭৭২ খ্রিঃ কোচবিহার ও কোম্পানির মধ্যে চুক্তি হয় ও মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়নকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ইতিমধ্যে কোচবিহারের মহারাজা স্থির করা হয়েছিল নাবালক ধরেন্দ্রনারায়নকে। ১৭৭৩ সালে কোম্পানি নাবালক ধরেন্দ্রনারায়নের সঙ্গে এক সন্ধির মাধ্যমে কোচবিহারকে নিজ অধীনস্থ করদ রাজ্যে পরিনত করে। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দেই কোম্পানি বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করেছিল। এবার কোচবিহারের সঙ্গে সন্ধি তথা করদ রাজ্যে পরিণত করার পর নাজির শান্তনারায়নের নামে বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বভাগ নামে যে তিনটি চাকলার ইজারা ছিল সেগুলিকেও নিজ অধীনে আনার চেষ্টা শুরু করে। এই তিনটি চাকলায় কোচবিহার রাজের আত্মীয় স্বজনদেরই আধিপত্য ছিল। ফলে চাকলা অধিনস্থ গ্রাম গুলিকে বলা হত *'রাজওয়ারা'* ও সেখানকার বাসিন্দাদের বলা হত *'রাজগির'*। সময়ান্তরে কোম্পানি এই চাকলা তিনটি নিজ অধীনে গ্রহন করলেও রাজওয়ারা গুলোতে কিন্তু কোচবিহারের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়। এই খণ্ড খণ্ড 'রাজওয়ারা' গ্রামগুলিই পরবর্তীতে রংপুরের অধীনস্থ কোচবিহারের আরও অনেককাল পরে বাংলাদেশের অধীনস্থ ভারতের ছিটমহলে পরিনত হয়।

উপরিউক্ত বিশ্লেষণে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ছিটমহল সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোচবিহার ও রংপুরের শাসকের মধ্যে পাশাখেলার কোন যোগাযোগ ছিল না,[৭] বরং *'মোগলান'* ও *'রাজওয়ারা'* তত্ত্বই বেশি সমর্থনযোগ্য ও ঐতিহাসিকভাবে গ্রহণযোগ্যও।

ব্রিটিশ আমলে কোচবিহার ছিল তার করদ রাজ্য আর রংপুর ছিল শাসনাধীন অঞ্চল। ফলে চাকলা ও তার অধীনস্থ ছিটমহল গুলি তেমন কোন সমস্যার কারন হয়ে উঠেনি যতটা হয়েছিল ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ ও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সৃষ্টির পর। তথাপি ইংরেজ আমলে চাকলা গুলির মধ্যে কিছু বিবর্তন দেখা গিয়েছিল। ১৮৫৪ সালে রংপুর জেলার অধীনে বৈকুণ্ঠপুর ও বোদা-কে নিয়ে সুকানি সাবডিভিশন গঠন করা হয়। ১৮৫৮ সালে নব সৃষ্ট এই সাবডিভিশনের সদর স্থানান্তরিত করা হয় জলপাইগুড়ির সেনা ছাউনিতে, ফলে এই সাবডিভিশনের নামকরন করা হয় জলপাইগুড়ি। পরবর্তীকালে সীমান্ত বিবাদ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্রিটিশরা ১৮৬৪ সালে ভূটানের কাছ থেকে পশ্চিম দুয়ারের কিছু স্থান দখল করে নেয়। দখল করা এই স্থান ও জলপাইগুড়ি সাবডিভিশনকে একসঙ্গে করে দিয়ে ১৮৬৭-৭০খ্রিঃ এক নতুন জেলা তৈরি করা হয় 'জলপাইগুড়ি' নামে। পাটগ্রাম চাকলা জলপাইগুড়ির নিকটস্থ

হওয়াতে তাকে জলপাইগুড়ির সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। বাদ থেকে যায় শুধু পূর্বভাগ, এই চাকলাটি বিচারগত দিক দিয়ে রংপুরের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও রাজস্ব জমা দিত এসে জলপাইগুড়িতে।[৮]

১৮৭৬ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে এক নোটিসে জানানো হয় রংপুরের ২০টি ছিটমহল কোচবিহারের মধ্যে রয়েছে। সেগুলি হল বত্রিশগাছ কিসমত, শিবপ্রসাদ মুস্তাফি, করলা, মশালডাঙা, কোছোয়া, কানটুনুগগর, বাঁশজানি ও পোয়াতর কুঠি প্রভৃতি। এদের মধ্যে সর্ববৃহৎ ছিটমহলটি ছিল দক্ষিণ মশালডাঙ্গা।[৯]

১৯০৫ খ্রিঃ লর্ড কার্জনের বঙ্গ বিভাগের সিদ্ধান্তে এই অঞ্চলে ছিটমহলগুলোর গণনাকে কেন্দ্র করে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বঙ্গ বিভাজনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থির করা হয় কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও রংপুর নতুন প্রদেশ 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম'-এর সঙ্গে যুক্ত হবে। কোচবিহার ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনায় স্বতন্ত্রভাবে নিজ ছিটমহলগুলি গণনা করতে পারলেও ১৯১১ সালে তা করতে গেলে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' এর তীব্র বিরধিতা করে। ফলে স্থির হয় কোচবিহার প্রশাসনিক দিক দিয়ে 'বাংলা প্রদেশের' সঙ্গেই যুক্ত থাকবে। বঙ্গ বিভাজনের সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হলে স্বয়ং কোচবিহারই পরিনত হত 'বাংলা প্রদেশের' বৃহত্তম প্রশাসনিক ছিটমহলে।[১০]

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহার ও রংপুরের মধ্যে সীমানা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে গণনায় দেখা যায় কোচবিহারের মধ্যে রংপুরের ২০টি ছিটমহল ৩২টিতে পরিনত হয়েছে, আর রংপুরের মধ্যে কোচবিহারে ছিটমহল ছিল ২০টি। ১৯৩৩ সালে ছিটমহল গুলি বেড়ে রংপুরের ৩৩টি ও কোচবিহারের ২২টিতে পরিণত হয়। অর্থাৎ ছিটমহলগুলো নিজেদের মধ্যে ক্রমশ বিভাজিত হচ্ছিল। ১৯৩১ সালে সীমানা নির্ধারণ বন্ধ হয়ে যায় আর্থিক সমস্যায়। ১৯৩৪ সালে স্থানীয় জনগনের তীব্র বিরোধিতায় সীমানা নির্ধারণ পিছিয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৩৬ সালে সম্ভব হয়েছিল, ফলে খুঁটিও পোঁতা হয়।

রংপুর ও কোচবিহারের মধ্যে সীমানা নির্ধারিত হলেও ছিটমহল গুলি কিন্তু বিনিময় হয় নি। ফলে ছিটমহল গুলির মানুষের ভয়ানক অবস্থা দেখা দেয় দেশভাগের পর। যদিও দেশভাগের সময় একটু সচেতনতা অবলম্বন করলে ছিটমহল সমস্যার বৃহদাংশই মিটে যেত। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত ভাগ হয় ধর্মের ভিত্তিতে আর ভারত-পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল স্যার সিরিল রাডক্লিফকে। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং অমুসলিম সংখ্যাগুরু হওয়ায় তা ভারতের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। অপরদিকে রংপুর ছিল সম্পূর্ণই মুসলিম সংখ্যাগুরু শুধুমাত্র ডিমলা ও হাতিবান্দা থানা বাদ দিয়ে। রংপুর পূর্ব পাকিস্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়। কোচবিহারে মোট মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৪০ শতাংশ, তথাপি ভারত ভুক্তিতে দুই বছর সময় লেগেছিল। যদিও এর কারন ছিল অন্যত্র, তাহল কোচবিহার ছিল সীমান্তবর্তী রাজ্য, কোচবিহারকে নিজ রাজ্যভুক্ত করার জন্য আসাম ও বাংলার মধ্যে টানাপড়েন, সর্বোপরি 'উত্তরাখণ্ড' প্রদেশ নির্মাণের প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা প্রভৃতি। দেশ ভাগ হলেও ছিটমহল গুলি কিন্তু বিনিময় হয়নি ফলে তা পূর্বাবস্থায়ই থেকে যায়। ফল স্বরূপ পূর্ব পাকিস্তানের ৯৫ টি ছিটমহল ঢুকে পরে ভারতের মধ্যে আর ভারতের ১৩০টি ছিটমহল রয়ে যায় পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে। যাদের আয়তন ছিল যথাক্রমে ১২,২৮৯,৩৭ একর ও ২০,৯৫৭,০৭ একর।[১১] রাডক্লিফ যদি উপযুক্ত সময় পেতেন তাহলে তিনি ছিটমহল সমস্যা সমাধান সম্ভব হত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোচবিহারের ছিটমহল শুধুমাত্র রংপুরেই

ছিল না, ছিট সম্বলিত কিছু ট্র্যাক জলপাইগুড়িতেও ছিল। দেশ বিভাজনের সময় জলপাইগুড়ির মধ্যে অবস্থিত পাঁচটি থানা পাটগ্রাম, বোদা, দেবীগঞ্জ, পচাগর ও তেতুলিয়া পূর্ব-পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয়, যা আদতে ছিল কোচবিহারের ছিটমহল। রংপুরের দুটি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ থানার কথা বলা হয়েছে ডিমলা ও হাতিবান্ধা । এই দুটি থানা যদি ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হত তাহলে এর মধ্যে অবস্থিত ভারতীয় ছিটমহল গুলি ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগ দিতে পারত। সাম্প্রতিক কালে ভারত-বাংলাদেশ জয়েনিং ওয়ার্কিং গ্রুপ-এর দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় বিনিময়যোগ্য ভারতীয় ছিটমহলের সংখ্যা ১১১ টি। এই ১১১ টির মধ্যে ৯৭ টির অবস্থানই ছিল পূর্বতন পাটগ্রাম, বাঁশকাটা ও তেলধার ট্র্যাকের মধ্যে ; বর্তমানে যা কিনা বাংলাদেশের বোদা, পচাগড়, দেবীগঞ্জ, পাটগ্রাম, ডিমলা ও হাতিবান্ধা থানার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অবস্থিত।[১২] র‍্যাডক্লিফ মহাশয় এই কাজটি করতে পারলে সমস্যা হত মাত্র ১৪ টি ছিটমহল নিয়ে। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান তো অনেক দূরের কথা, তিনি সীমানা নির্ধারণের মাধ্যমে দিয়ে গেলেন আরেক যন্ত্রণা 'বেরুবারি সমস্যা'।

স্বাধীন ভারতে ছিটমহল গুলির বিবর্তন

স্বাধীন ভারতে ছিটমহল সমস্যা নিয়ে যে ভাবা হয় নি, তেমন না। তবে নানান কারনে এই আন্তর্জাতিক তথা ব্যাতিক্রমি সমস্যা সমাধানে সময় লেগে গিয়েছিল ৬৮ বছর । আর এই বছর গুলিতে ছিটমহলের অধিবাসীদের দিনগুলি কেটেছে নরকের থেকে কোন অংশে কম নয় । ছিট গুলোর গঠন কাঠামোর জন্য প্রশাসনিক কার্যকলাপ ও নাগরিক কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না বললেই চলে এর পাশাপাশি এই স্থানগুলো সমাজবিরোধীদের জন্য হয়ে উঠেছিল স্বর্গরাজ্য। এমনই এক ঘটনা ঘটে ২০১০ সালের ২৯শে মার্চ ভারতের ভিতর বাংলাদেশি ছিটমহল মশালডাঙ্গার এক আসন্ন প্রসবা মা-কে হাসপাতালে ভর্তির জন্য নিয়ে আসলে সরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ভর্তি তো নিতে চায় নি বরং ডাকা হয়েছিল পুলিশকে। শেষ পর্যন্ত কোচবিহার জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে মশালডাঙ্গার সেই মা কে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। [১৩] এছাড়াও এর আগে এমন একাধিক ঘটনা ঘটেছে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় ব্যক্তিদের নিজ আত্মীয় হিসাবে পরিচয় দিতে হয়েছে। আর অপরাধীদের কেন স্বর্গরাজ্য! তা কয়েকটি বিষয় দেখলেই আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়, ২০০৬ সালে পোয়াতরকুঠি ছিটমহলে জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে এক যুবক খুন হয় তাছাড়া এই ছিটে মাঝে মাঝেই ডাকাতির খবর আসে। ২০১০ সালে মশালডাঙ্গা ছিটমহলে এক মহিলার মৃতদেহ পাওয়া যায়, এছাড়া দুজন ব্যাক্তিও পুড়ে মারা যায়। ২০১৪ সালে ভারতীয় ছিটমহল ভোটবাড়িতে এক গৃহবধূ তার স্বামীর হাতে খুন হয় বলে অভিযোগ উঠে। ওই মহিলার মৃতদেহ ১৮দিন ধরে বাংলাদেশের মর্গে পরেছিল আর অভিযুক্ত প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকে। শেষ পর্যন্ত দুই দেশের দূতাবাসের মধ্যে আলোচনার পর ওই মৃত দেহকে ভারতের মাথাভাঙ্গায় নিয়ে আসা হয় ময়নাতদন্তের জন্য আর বাংলাদেশ পুলিশকে নিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছিল মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ।[১৪]

ভারতের স্বাধীনতা লাভ তথা দেশভাগের পর থেকে ২০১৫ সালের জুলাই মাস অর্থাৎ ছিটমহল গুলো বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত এর গতিবিধি কী ছিল তা আলোচনার সুবিধার জন্য এই সময়কালকে দুই

ভাগে ভাগ করে নিব। প্রথমতঃ ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত। এই সময়কালের মধ্যে ভারত-পাকিস্থানের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মধ্য নির্ভর করছিল ছিটমহল গুলির ভবিষ্যৎ। দ্বিতীয়তঃ ১৯৭১ সাল অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভ করে বাংলাদেশে রূপান্তরিত হওয়া থেকে ২০১৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত। এরপরেও কিন্তু দহগ্রাম ও অঙ্গারপোতা নামে বাংলাদেশি ছিটমহল ভারতের অভ্যন্তরেই থেকে যায়।

বেরুবাড়ি সমস্যা- অমীমাংসিত নেহেরু-নুন চুক্তি, ১৯৫৮ খ্রীঃ

ভারত ভেঙ্গে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে। আর ছিটমহল গুলো যেখানে অবস্থান করতো সেখানেও যে ধর্মীয় গোলযোগ হয়নি তা কিন্তু বলা যায় না। দিনহাটা থেকে মুসলমানরা দলে দলে পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিল আর মশালডাঙ্গা ছিটমহলেও প্রচুর পরিমানে আশ্রয় নেয়। তবে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ছিটমহলের অধিবাসীরা ধর্মীয় আঘাতের শিকার হলেও প্রশাসনিক পার্থক্য তখনও বুঝে উঠেনি। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তারা পুর্বের মুদ্রাই ব্যবহার করত ফলে দেশ বিভাজন ও ছিটমহলের যন্ত্রণা বুঝে উঠতে পারেনি। এই যন্ত্রণা আরও তীব্রতর হয় যখন ১৯৫২ সালে উভয় দেশে যাতায়াতের জন্য পাসপোর্ট ও ভিসার প্রচলন করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত সমস্যা তখন চরমে তাই সমাধানের জন্য ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নুন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বিশেষ উদ্যোগ নেয়। উভয়ের মধ্যে এক চুক্তি সাক্ষর হয় আর তাতে বিভাজন করা হয় বেরুবাড়ি নামে এক ছিটমহলকে। কিন্তু হিমশৈলের মত সমস্যা ছিল পিছনে লুকায়িত। চুক্তি সাক্ষরের পর নুন যেমন পাকিস্তানে বিশাল বিরোধের সম্মুখীন হন ঠিক তেমনি ভারতের পার্লামেন্টেও নেহেরু চরম বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। এমনকি পাকিস্তানের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্য তথা মুসলিম লিগের নেতা ফজলুর রহমান নুন এর সাক্ষরিত এই চুক্তিকে 'পাকিস্তানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা' বলে অভিহিত করেছেন এবং ভারতের প্রতি করা সতর্কবার্তাও পাঠায় যে ভবিষ্যৎ সরকারের এই চুক্তির প্রতি কোন দায়বদ্ধতা নেই। এই সমস্ত ঘটনাই সেপ্টেম্বর মাস যাবৎ ঘটছিল, আর অক্টোবর মাসেই পাকিস্থানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়। ৭ই অক্টোবর রাষ্ট্রপতি ইস্কিন্দার মির্জা ফিরোজ খান নুনের শাসনের অবসান ঘটায় ও দেশজুরে মার্শাল ল চালু করে, জেনারেল আয়ুব খানকে প্রথমে চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর করা হয় পরে তাকে ২৪শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করা হয়। অপরদিকে 'নেহরু-নুন চুক্তি' নিয়ে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ভারতীয় পার্লামেন্টে বিশেষ প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এমনকি এমনও প্রশ্ন উঠতে শুরু করে প্রধানমন্ত্রীর এহেন কোন অধিকার আছে কিনা, দেশের কোনও স্থানকে পার্লামেন্টের অজ্ঞাতসারে অন্য দেশের হাতে তুলে দেওয়া। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের বিধান চন্দ্র রায়ের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসি মন্ত্রিসভাও বেরুবারিকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এরুপ কাজের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। এদিকে বেরুবাড়ির মানুষও নেহরু-নুন চুক্তির বিরুদ্ধে ফুঁসতে থাকে। ২৬শে সেপ্টেম্বর ডঃ বিধান চন্দ্র রায় বেরুবাড়িতে আসেন, সঙ্গে থাকে স্থানীয় কিছু নেতা যেমন অমর রায় প্রধান, প্রফুল্ল ত্রিপাঠি ও নিরঞ্জন দত্ত প্রমুখগন। এমনকি বেরুবাড়ি হস্তান্তরের বিরুদ্ধে প্রফেসর নির্মল বোসের নেতৃত্বে গঠিত হয়

'বেরুবাড়ি প্রতিরক্ষা সমিতি'। এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কী হতে পারে তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত মামলা চলে যায়। শেষ পর্যন্ত নেহরু-নুন চুক্তি তার আকাঙ্খিত সফলতা লাভ করতে পারে নি।[১৫]

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ইন্দো-পাক যুদ্ধ ও ছিটমহল

নেহরু-নুন চুক্তির ঠিক চার বছর আগে অর্থাৎ ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এক প্রতিরক্ষা বিষয়ক চুক্তি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তির পর পরবর্তী দশক জুড়ে পাকিস্তানে নানা রকম সামরিক সাহায্য পাঠাতে থাকে আর এই পরিমাণও ছিল প্রায় ৭০০ মিলিয়ন ডলারের। এছাড়াও পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য পাঠানো হয় প্রায় ২.৫ বিলিয়ন ডলার।[১৬] অধিক অর্থই পাকিস্তানের মতিভ্রম করেছিল। কাশ্মীরের সীমান্ত সমস্যা ভারত- পাকিস্থান সৃষ্টি হওয়ার কাল থেকেই ছিল। তাছাড়া ১৯৬২ সালে চীনের সাথে ভারতের যুদ্ধ নতুন ভাবে জেগে উঠা ভারতে কিছুটা আঘাতই এনেছিল। পাকিস্তান ভেবে নিল এর মধ্যেই যদি কোনও রকম ভারতকে চাপে রেখে কাশ্মীরকে দখল করা যায়। আমেরিকার কাছ থেকে পাওয়া অর্থ দিয়ে পাকিস্তান নিজেদের সামরিক সজ্জাকে আধুনিক করে তুলে আর এই আধুনিক সেনাকে ভারতের বিরুদ্ধে খাটিয়ে পরখ করে নিতে চাচ্ছিল। পাকিস্তানের পরিকল্পনা ছিল কাশ্মীরে প্রচুর পরিমানে পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারী প্রবেশ করিয়ে দিয়ে কাশ্মীরবাসিকে ভারত বিরোধী ভাবনায় প্রভাবিত করা ও সেই অজুহাতে সেনা অভিযান চালানো। ভারতেও সেসময় মাত্র একবছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, কারন ১৯৬৪-র মে মাসেই মারা গিয়েছেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। ১৯৬৫-র এপ্রিল মাস, গুজরাটের কচ্ছের রান অঞ্চলকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে জল মেপে নেওয়ার চেষ্টা করে। আগস্ট মাসে কাশ্মীরে অনুপ্রবেশকারী ঢুকতে থাকে, প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী সেনাকে নির্দেশ দেন অনুপ্রবেশকারীদের পথ রুদ্ধ করে দিতে। পাকিস্তান এখানে বাঁধা পেয়ে ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ তে দক্ষিণ-পশ্চিম জম্মু কাশ্মিরের ছয়টি সেক্টরে ট্যাঙ্ক ও পদাতিক সেনা পাঠাতে শুরু করে। ভারতের পূর্ব প্রান্তেও এসময় যুদ্ধের আঁচ আসতে শুরু করেছে। দহগ্রাম হল ভারতের ভিতর পাকিস্তানের একটি বড় ছিটমহল আর এর সঙ্গে পাকিস্তানের যোগাযোগ করতে হলে আসতে হতো ভারতীয় ভূমি তিনবিঘার ওপর দিয়ে। পাকিস্তান অভিযোগ করে দহগ্রামের চারিপাশে ভারতীয় সৈন্য জমায়েত হয়েছে ও তা দখল করে নিয়েছে। ভারত, পাকিস্তানের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার করে। ভারত এখানে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে পাকিস্তানি সৈন্য হিন্দুদের দহগ্রাম থেকে বিতারিত করছে। ভারত সরকার পার্লামেন্টে এও সুনিশ্চিত করে যে ভারতের এক ইঞ্চি স্থানও পাকিস্তান দখল করে নিতে পারে নি।[১৭] ৩ রা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ সন্ধ্যায় চারজন পাকিস্তানি নাগরিক মেখলিগঞ্জে ভারতীয় ভূমিতে চলে আসে, তাদের মধ্যে একজন সীমান্ত পুলিশের হাতে ধরা পরে ও বাকি তিনজন পালিয়ে যায়। এই সময়কালে পাকিস্তানি সীমান্ত পুলিশ দহগ্রাম থেকে ভারতীয় বাহিনীর ওপর গুলি চালাতে থাকে আর সেই সুযোগে পাকিস্তানের মুল ভূমি থেকে দহগ্রামে অনুপ্রবেশকারী মুজাহিদ আসতে থাকে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই এভাবে ৫২ জন মুজাহিদ দহগ্রাম থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ করে। পরের দিন ৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫, সকালে পাকিস্তান

রাইফেলস এর সহযোগিতায় বন্দুকধারী কিছু পাকিস্তানি ভারতের সীমান্ত গ্রাম মাথাভাঙ্গার ভাগরানগুড়িতে ঝাঁপিয়ে পরে, এই অনুপ্রবেশকারীদের হাতে ছিল তীর-ধনুক, তলোয়ার-বন্দুক। ডাকাতি লুণ্ঠনের মাধ্যমে আক্রান্ত বাড়ি থেকে ৪০০০ টাকার সম্পত্তি তারা নিয়ে নেয়। ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ সাল পাকিস্তানের উত্তেজিত জনতা মোগলঘাটে ভারতের যাত্রীবাহী ট্রেনটি আটকে দেয়, রেলকর্মীদের মারপিট করে আর এও হুমকি দেয় এই পরিস্থিতির জন্য তারা দায়ি নয়। আসলে ট্রেনটি চলত ভারতের গিতালদহ থেকে পাকিস্তানের মোগলঘাট পর্যন্ত।

পাকিস্তানের অভ্যন্তরে দুটি ভারতীয় ছিটমহল হল দহলা খাগড়াবাড়ি ও কোটভাজানি। পাকিস্তানি সেনারা এই দুটি ছিটমহলের জনগনের ওপর অত্যাচার চালায় উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার জনগনকে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া যেকোনো ভাবেই হোক। দহলা খাগরাবাড়িতে দুবার যেমন ডাকাতি হয় আবার কোটভাজানিতে এক মহিলাকে অপহরন করা হয় পাকিস্তানি নাগরিকের দ্বারা। এছাড়াও পাকিস্তানি রাইফেলস ভারতীয় ছিটমহল ডাঙ্গাপারা, ভোগডাবরি, কোকটিবাড়ি, এবং গমনেটি প্রভৃতি স্থানে ক্রমাগত নাগরিকদের ওপর অত্যাচার করতে থাকে আর তারা যখন নিজেদের ভারত মুলভুমিতে ঘুরতে আসতো তখন সেসময় তাদের ঘর বাড়িগুলো অন্যদের দ্বারা ডাকাতির শিকার হতো।[১৮] প্রায় সপ্তাহ দুয়েক যুদ্ধ চলার পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তিনবিঘার অপরপ্রান্তে সাদা পতাকা উত্তোলন করে, ভারতীয় সেনাও তাদের অনুমতি দেয় ছিটদহ গ্রামে যাবার জন্য।

পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধ ১৯৭১ ও ছিটমহলঃ ভারতের ভূমিকা

ইতিমধ্যে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে গৃহযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হয়, আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবর রহমান অ্যাসেম্বলি নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্থানের ১৬২ টি আসনের মধ্যে ১৫১ টি জিতে নেয় আর অপর দিকে সমগ্র পাকিস্তানের মোট আসনও ছিল ৩০০ টি। ফলে মুজিবরের আওয়ামি লীগ পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। যদিও সেই বছরেই পাকিস্তানে ১৩ টি মহিলা সংরক্ষিত আসনেরও সূচনা করা হয়। নতুন সংবিধান গঠনের দায়িত্ব মুজিবর রহমানের হাতে, কিন্তু পাকিস্তান পিপলস পার্টি ও মুসলিম লীগ আইন সভায় যোগ দেয় নি বরং মুজিবরের সাথে বোঝাপড়ার চেষ্টা চালিয়েছে। তারা ব্যর্থ হয়। ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সালে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়, মুজিবর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। মাতৃভূমি প্রিয় পূর্ব পাকিস্তানের দামাল সন্তানেরা গঠন করে 'মুক্তি বাহিনী'। গৃহযুদ্ধের ভয়াবহতায় কাতারে কাতারে পূর্ব পাকিস্থানের নাগরিক ভারতে আশ্রয় নিতে থাকে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী তখন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি। তিনি এই শরণার্থী সমস্যাকে আন্তর্জাতিক করে তুলেন। আর পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীন সরকার তৈরি না হলে যে এই সমস্যা মিটবে না, তা তিনি বুঝতে পারেন। তাই বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানিদের তাড়িয়ে বাংলাদেশের সরকার গঠন খুব জরুরী, আর এই কাজ বাস্তবায়ন করতে গেলে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব পাকিস্তানে বর্ষাকালে অভিযান চালান কঠিন তাই সঠিক সময়ের অপেক্ষায় থাকেন প্রধানমন্ত্রী, নভেম্বর নাগাদ ভারতীয় সেনারা একরকম প্রস্তুতি সেরে রাখে। অন্যদিকে পাকিস্তানও মুক্তিবাহিনীর গরিলা যুদ্ধ ও ভারতের অবস্থানে বিচলিত, এই অবস্থার মধ্যে প্রথম আক্রমন প্রথম সুবিধার নীতি বাস্তবায়নে পাকিস্তান ১৯৭১ এর ৩রা ডিসেম্বর উত্তরপশ্চিম ভারতের আটটি স্থানে বিমানহানা

চালায়। ভারতও আর সময় ব্যয় না করে ৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় আর পশ্চিম ও পূর্ব দুটি ফ্রন্টেই যুদ্ধ শুরু করে। ভারতের পরিকল্পনাই ছিল পশ্চিম ফ্রন্টে পাকিস্তানকে ব্যাস্ত রেখে দ্রুত পূর্ব পাকিস্তান অভিযান সম্পন্ন করা কারন আমেরিকা ও চীন ভারতের এই পদক্ষেপের বিরোধী ছিল যদিও রাশিয়ার সম্পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিল ভারত। সেদিন ছিটমহল গুলো সাক্ষী ছিল ভারতীয় সেনা অভিযানের। ৭ই ডিসেম্বর ভারতীয় সেনা দিনহাটা থেকে কুড়িগ্রামের দিকে রওনা দেয়, ৮ই ডিসেম্বর আরেকটি সেনাদল জলপাইগুড়ি থেকে পচাগর হয়ে ঠাকুরগাঁও এর উদ্দ্যেশে অভিযান চালায়। মাত্র তেরো দিনের যুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ করে। অপরদিকে পাকিস্তানেও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে, ইয়াহিয়া খানকে সরিয়ে দিয়ে জুলফিকার আলি ভুট্টো ক্ষমতাসীন হয়। ৮ই জানুয়ারি ১৯৭২ শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের হাত থেকে মুক্তি পান আর তার ঠিক চারদিন পর তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী রূপে দায়িত্ব গ্রহন করেন।

ইন্দিরা-মুজিবুর স্থল সীমান্ত চুক্তি ১৯৭৪ ও তিনবিঘা সমস্যা

পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাদেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ ছিটমহলের বিবর্তনে এক নতুন রুপ সামনে নিয়ে আসে আর যার শুরু হয় আবার আগামী ৪৪ বছরের পথ চলা। ১৯৭২ সালেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় এক বাণিজ্যিক চুক্তি, সেসময়ে সীমা নিয়ে তেমন আলোচনা না হলেও তার দুবছর পর ১৯৭৪ সালের মে মাসে মুজিবুর রহমান দিল্লিতে আসেন আর সেসময় সীমান্ত নিয়ে উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আলোচনা হয়। ১২ মে থেকে ১৬ মে-র মধ্যে হয়ে যাওয়া সীমান্ত চুক্তিতে স্থির করা হয় ভারত পাবে বেরুবারি ইউনিয়ন আর বাংলাদেশ পাবে ভারতের অভ্যন্তরে তাদের বৃহত্তম ছিটমহল দহগ্রাম ও অঙ্গারপোতার সঙ্গে মুল বাংলাদেশ থেকে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একটি ১৭৮ মিঃ দৈর্ঘ্য ও ৮৫ মিঃ প্রস্থের করিডর, যাকে তিন বিঘা করিডর বলে অভিহিত করা হয়। ভারতকে বেরুবারি প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার খুব দ্রুত এই বিষয়টি নিজ পার্লামেন্টে পেশ করে আর ছোট্ট এক বিতর্কের মধ্য দিয়ে ২৭শে নভেম্বর ১৯৭৪ এ বিলটি পাশ করিয়ে নিয়ে আসে। যদিও বিষয়টি খুব কম সময়ে ঘটলেও অতটা সহজেও ঘটেনি। ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার চারদিনের মাথায় কাজী মুখলেসর রহমান নামে এক ব্যাক্তি ঢাকা হাইকোর্টে এই চুক্তির বিরুদ্ধে মামলা করেন। কিন্তু বিচারক এই বলে মামলাটিকে মিটমাট করে দেয় যে, মামলাকারী ব্যাক্তি প্রভাবিত ছিটমহলের বাসিন্দা নয়, আর তিনি এই চুক্তির ভাল মন্দ কোন কিছুর দ্বারা প্রভাবিত নয়।

বাংলাদেশে বিষয়টি অতিসহজে মিটে গেলেও ভারতে কিন্তু এই সমস্যা সহজে মিটবার ছিল না। কারণটি হল তিনবিঘা করিডরের ভৌগলিক অবস্থান। এই করিডরের পূর্বদিকে বাংলাদেশের মুলভূমি পাটগ্রাম আর পশ্চিমে ছিটমহল দহগ্রাম ও অঙ্গারপোতা, উত্তরে ভারতের কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জের উত্তরাংশ আর দক্ষিণে মেখলিগঞ্জ জেলার কুছলিবাড়ি এলাকা। কুছলিবাড়ির জনগনের মেখলিগঞ্জের বাকি অংশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য তিনবিঘাই একমাত্র ভরসা। কারন কুছলিবাড়ির পূর্ব ও পশ্চিম উভয়দিকেই বাংলাদেশ আর যতটুকুবা জায়গা পশ্চিম দিকে আছে মেখলিগঞ্জের মুল

অংশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্যও তাও আবার তিস্তা নদী প্লাবিত। ফলে কুছলিবাড়ির মানুষ ভয় ভীত হয় এই ভেবে সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়িত হলে আর তিনবিঘা করিডর বাংলাদেশকে দিলে কুছলিবাড়ি নিজেই যোগাযোগের দিক দিয়ে বাংলাদেশের ভিতরে ভারতের ছিটমহলকে পরিনত হবে। এমন অবস্থা যেন সৃষ্টি না হয় এর জন্য বিরোধী কমিটিও গঠিত হয়। একটি হল 'তিনবিঘা সংগ্রাম সমিতি' ও আরেকটি হল 'কুছলিবাড়ি সংগ্রাম সমিতি'। অপরদিকে তিনবিঘা করিডোর নিয়ে লোকসভাতেও আলোচনা শুরু হয়। ১৯৮১ সালের ২রা এপ্রিল বি জে পি-র শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর এক প্রশ্নে তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী পি ভি নরসিংহ রাও জানান, তিনবিঘা করিডোরের সার্বভৌমত্ব সম্পূর্ণভাবে ভারতের হাতে থাকবে আর কুছলিবাড়ির সঙ্গে মেখলিগঞ্জের যোগাযোগের পথ কখনও বন্ধ হবে না, আর ভারতের কোন অংশকে চুক্তির দ্বারা বিচ্ছিন্ন করার প্রশ্নই উঠতে পারে না।[১৯] কোচবিহার থেকে নবনির্বাচিত সাংসদ শ্রী অমর রায়প্রধানও এবিষয়ে একাধিক প্রশ্ন লোকসভাতে উত্থাপন করেন। ১৯৮১ সালের ৬ই জুলাই বাংলাদেশের আধিকারিকরা ছিটমহল দহগ্রাম ও অঙ্গারপোতায় জনগণনার জন্য তিনবিঘার ওপর দিয়ে আসলে কুছলিবাড়ি সংগ্রাম সমিতি এর তীব্র প্রতিবাদ করে। আন্দোলনে এগিয়ে আসে কমল গুহ, অমর রায়প্রধান, দীপক সেনগুপ্ত প্রমুখগণ। পুলিশ অবস্থার উপর নিয়ন্ত্রন রাখতে গুলি চালায়, সুধীর রায় নামে এক যুবক পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। অবস্থা এতটাই জটিল হয়ে উঠে ভারত সরকার তিনবিঘা করিডোর বাস্তবায়ন পিছিয়ে দেয়। রাজ্য রাজনীতিতেও এনিয়ে চরম বিশৃঙ্খলা সূচনা হয়। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও তথ্য-সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে বাম শরিক তথা কৃষিমন্ত্রী কমল গুহর গভীর বিবাদ দেখা দেয়। জ্যোতি বসুর বক্তব্য ছিল সীমান্ত চুক্তি একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি তাই তাকে মানতেই হবে, কিন্তু কমল গুহ তা মানতে রাজি ছিলেন না। ফলে কমল গুহকে মাথাভাঙ্গাতে গ্রেফতার করে সরকারি অতিথিশালাতে আটকে রাখা হয়। ফলস্বরূপ আন্দোলনের তীব্রতা আর বৃদ্ধি হয়, আন্দোলনের দায়িত্ব নেন অমর রায়প্রধান ও দীপক সেনগুপ্ত। ফরওয়ার্ড ব্লক দলের রাজ্য সম্পাদক অশোক ঘোষ মহাশয় তাঁরই দলের বিশিষ্ট নেতা তথা রাজ্যমন্ত্রী কমল গুহকে তাঁর অবস্থানের জন্য দল থেকে বহিস্কার করেন। বহিষ্কৃত নেতা কমল গুহ নতুন করে তৈরি করেন সমাজতান্ত্রিক ফরওয়ার্ড ব্লক দল আর শুরু করেন তিনবিঘা বাঁচাও আন্দোলন। তাঁর সঙ্গে এসে এই আন্দোলনে যোগ দেয় ফরওয়ার্ড ব্লক বিধায়ক পরেশ অধিকারী ও গোবিন্দ রায়। এই আন্দোলনের ফলেই তিনবিঘা করিডোর বাস্তবায়ন করা অনেকটা পিছিয়ে যায় আর আন্দোলনের নেতারা ক্রমাগত দাবী করতে থাকেন দুই দেশের মধ্যে ছিটমহল গুলো বিনিময়ের জন্য।

শেষ পর্যন্ত তিনবিঘা করিডোর তার বাস্তব রুপ পায় ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে জুন। আর এই এক দশকের মধ্যে ঘটে গিয়েছিল অনেক ঘটনা। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা সুগন্ধা রায় কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করে ১৯৭৪ চুক্তির বৈধতা নিয়ে, ১৯৮৪ সালে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে তারের বেড়া লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়, ১৯৮৬ সালে সীমান্ত সার্ভের কাজ শুরু হয় আর বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট এরসাদ দহগ্রাম ও অঙ্গারপোতা দেখার জন্য আসেন আর এই দুটি ছিটকে বাংলাদেশের মুল অংশের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ফ্লাইওভারের পরামর্শ দেন, ওই বছরেই বাংলাদেশের গৃহমন্ত্রী মহমুদল হাসান দহগ্রামে ভ্রমনের জন্য আসেন। ১৯৯০তে সুপ্রিম কোর্টে ইন্দো বাংলাদেশ চুক্তির বৈধতা নিয়ে

যাবতীয় মামলার যেমন অবসান ঘটে ঠিক তার পরের বছর জমি অধিকরণ মামলা বাতিল হয় কলকাতা হাই কোর্টে, ওই বছরেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কুছলিবাড়িতে পরিদর্শনে আসেন, আবার লোক সভাতেও বিষয়টি তুলে ধরে লাল কৃষ্ণ আডবানি। তার ঠিক দুবছর পর অর্থাৎ ১৯৯২ সালে মে মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও এর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় এক জলচুক্তি। এই সুসম্পর্কের প্রভাব পড়ে তিনবিঘা করিডোরের ওপরেও। পূর্বের সব বাধা সরিয়ে তিনবিঘা করিডোর বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ১৯৯২ এর ২৩শে জুন বি জে পি-র বিশেষ নেতা ডঃ মুরলি মনোহর যোশী শিলিগুড়ি হয়ে কুছলিবাড়ি চলে আসে বিরোধিতার জন্য। অন্যদিকে সেদিনই কমল গুহ, বিমল বোস, হিতেন নাগ ও অমর রায় প্রধানকে গ্রেফতার করা হয়। তারপরের দিন লালকৃষ্ণ আদবানি করিডোর হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কিছুটা দেরী অবলম্বনের কথা বলেন আর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিংহকে রাওকে কুছলিবাড়ি আসার অনুরোধ করেন। এই ঘটনায় উত্তপ্ত দিনহাটার কাছে ২৫শে জুন বিকালে প্রায় দুহাজার আন্দোলনকারীকে গ্রেফতার করা হয়।

২৬ শে জুন, ১৯৯২ সাল। এই দিনের ঠিক সকাল ১০:৩০ মিনিটে তিনবিঘা করিডোরের চারটি পার্শ্বে চারটি পতাকা লাগান হয়। এক কড়া সুরক্ষার মধ্যে করিডোর খুলে দেওয়া হয়, বাংলাদেশ থেকে লালমনিহাটের ডেপুটি কমিশনার খলিল রহমান ও রাজশাহী ডিভিশনের অ্যাডিশনাল কমিশনার মিঃ সিরাজুল হক করিডোর হয়ে আসলে কোচবিহারের ডিসট্রিক্ট মেজিস্ট্রেট এস গোপাল কৃষ্ণন স্বাদরে অভিবাদন জানায়। একঘন্টা পর পর করিডোর খোলা রাখার কথা বলা হয়, কিন্তু সুরক্ষার কারনে তা তিনঘণ্টা পর পর করা হয়, আর তা হল সকাল ৭-৮ টা, দুপুর ১২-১ টা ও সন্ধ্যা ৫ টা থেকে ৬ টা।

তিনবিঘা করিডোর চালু হওয়ার পরেও কিন্তু ছিটমহলবাসীদের মধ্যে যে দুঃখের অবসান ঘটেছিল তা কিন্তু নয়, এতো ছিল শুধু দহগ্রাম ও অঙ্গারপোতা নিয়ে বাদবাকি অন্যান্য ছিটমহল গুলি এখনও কিন্তু সেই অন্ধকারেই। এরই মধ্যে একাধিকবার প্রশ্ন উঠেছে ছিটমহল বিনিময় নিয়ে, কখনও লোকসভা আবার কখনওবা রাজ্যসভাতে। ১৯৯৫ সালের ২০শে মার্চ অমর রায় প্রধান যখন সরকারের কাছে জানতে চায় যে সরকার ছিটমহলের বাসিন্দাদের ভোটাধিকারের কথা কী ভাবছে, সেসময় সরকারের স্পষ্ট উত্তর ছিল ছিটমহল গুলিতে সরকারের কোন প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রন নেই। ১৯৯৬ সালের ১১ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন দিল্লিতে বৈঠকে আসেন সেসময় অমর রায় প্রধান সংসদে আবার ছিটমহল সংক্রান্ত বিষয় উত্তাপন করেন। তাঁর দাবী ছিল তিনবিঘার মত করেই দাইখাতাতে আরাই বিঘা জমির উপর করিডোর করা হোক যাতে সালবাড়ির মানুষের যোগাযোগ সুবিধা হয়। কোন একসময় বি জে পি-ও দাবী জানায় পশ্চিম দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বাংলাদেশের তেঁতুলিয়ার ওপর দিয়ে করিডোর করা হোক। ১৯৯৭ সাল নাগাদ উভয় দেশের ছিটমহল কতগুলি আছে তা গননা করা হয়। অপরদিকে বাংলাদেশের গৃহমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম বাংলাদেশের পার্লামেন্টে ১৯৯৮ সালের ৮ই মার্চ এক উত্তরে তিনি জানান ছিটমহলের অধিবাসীদের নাগরিকতা নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হোক, তারা বাংলাদেশ অথবা ভারত কোন দেশের বাসিন্দা হতে চায়। ওই বছরেরই ৩১শে মার্চ দমদমের (পশ্চিমবঙ্গ) বিজেপি সাংসদ তপন সিকদার প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর কাছে জানান অতিদ্রুত ছিটমহল সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত, কারন এই

এলাকা গুলো দিয়ে চোরা পাচার থেকে যাবতীয় অবৈধ কাজ এমনকি বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। ১৯৯৯ এ পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্য সীমান্তে কাঁটাতার স্থাপনের পরিকল্পনা ঘোষণা করে। এই বছরেরই এপ্রিল মাসে সংসদে অমর রায় প্রধান বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করে এমনকি এও অভিযোগ আনা হয় বিরোধী আসনে থাকাকালীন বিজেপি ছিটমহল সমস্যা নিয়ে যতটা আগ্রহী থাকে ক্ষমতায় আসলে সব ভুলে যায়, কারন হিসাবে তুলে ধরা হয় ছিটমহলের অধিবাসীরা মুসলিম, তপসিলি জাতি ও তপসিলি উপজাতির অন্তর্ভুক্ত বলে। জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ঢাকায় দেওয়া ছিটমহল বিনিময় সংক্রান্ত সদর্থক কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ২০০০ সালের ডিসেম্বরে দুই দেশেরই বিদেশমন্ত্রক আলোচনায় বসে আর একটি যৌথ সীমান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করে। ২০০৭ এর মে মাস নাগাদ উভয় দেশের ছিটমহলে জনগণনা শুরু হয় আর ২০১০ সালের জুলাই মাসে তা শেষ হয়।

হাসিনা-মনমোহন চুক্তিঃ এক নতুন দিগন্ত

২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের মধ্যে এক চুক্তি হয়। তাতে বলা হয় ছিটমহল সমস্যার সমাধান ঘটবে, যেখানে ভারত পাবে ৭১ টি ছিটমহলের মধ্যে ৫১ টি আর বাংলাদেশ পাবে ১১৯ টির মধ্যে ১১১ টি এই মোট ছিটমহলের আয়তন যথাক্রমে ৭১১০ একর ও ১৭১৬০ একর। আর ২০১০ সালের যৌথ জনগননা অনুযায়ী ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের ছিটমহল গুলিতে মোট জনগন ছিল ১৪২১৫ জন আর বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতের ছিটমহলগুলিতে মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৭২৬৯ জন। এই ছিটমহলের জনগণরা নিজ ইচ্ছামত নিজ দেশ পছন্দ করতে পারবে। অপরদিকে তিনবিঘা করিডোরকে বাংলাদেশী জনগনের যাতাযাতের সুবিধার্থে এখন থেকে ২৪ ঘণ্টা ধরেই খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[২০]

অপরদিকে ভাবা হয় ১৯৭৪ সালের স্বাক্ষরিত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত চুক্তিকে বাস্তবায়িত করতে হলে ভারতীয় সংবিধানে একটি সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই ভারতের বিদেশমন্ত্রী সলমন খুরসিদ ২০১৩ সালের ১৮ই ডিসেম্বের ভারতের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় ১১৯তম সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করেন। পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি এই বিলের রিপোর্ট দেয় ২০১৪-এর ১লা ডিসেম্বর আর ২০১৫ সালের ৬ই মে বিলটি রাজ্যসভায় পাশ হয়, ঠিক তার পরের দিন লোকসভাতেও বিলটি পাশ হয়ে যায়। লোকসভাতে বিলটি পাশ হওয়ার প্রায় একমাস পর ৬ই জুন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় সাক্ষাৎ করেন, সঙ্গে ছিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সীমান্তচুক্তির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই সাক্ষাৎ সম্পর্কে বলেছিলেন 'watershed moment'.[২১] ভারতের পার্লামেন্টে আইনিভাবে যখন ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময়ের অগ্রগতি চলছিল তখন প্রকৃতপক্ষে ছিটমহল গুলিতেও রাজনীতির হাওয়া লেগেছিল। ১১ই ডিসেম্বর ২০১৪, মশালডাঙ্গা ছিটমহলের কাছে বড়তলায় বিজেপি-র যেমন সভা হয় তার ঠিক কিছুদিন আগে ছিটমহল লাগোয়া নয়ারহাঁটে সভা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯শে মার্চ ২০১৫ সালে বিশ্বকাপ কোয়াটার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও বাংলাদেশ, ভারতের অভ্যন্তরে

বাংলাদেশের ছিটমহল মশালডাঙ্গার বাসিন্দা জয়নুল আবেদিন ব্যাটারি চালিত টি ভি তে খেলা দেখতে দেখতে বারবার ভারত জয়ের প্রার্থনা করে যাচ্ছিল। কোথাও বা ধোনি, কোথাও বা শামির ছবি আবার কোথাও ভারতীয় পতাকা বাসিন্দারা হাতে ধরে ভারতের সমর্থনে ভারতীয় মনে প্রানে হয়ে উঠেছিল।[২২]

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ছিটমহল গুলিকে বিনিময়ের তারিখ ঠিক করা হয় ৩১শে জুলাই ২০১৫ সাল, যদিও তার শেষ সময় ছিল ৩০শে জুন ২০১৬ সাল পর্যন্ত। কিন্তু সার্বিক ক্ষেত্রে যে ছিটমহল গুলো বিনিময় হয়েছিল তা কিন্তু নয়। ভারত ও বাংলাদেশের নিজেদের মধ্যে সীমান্ত ভাগ করে চার হাজার কিলোমিটার, এরমধ্যে কিছু ক্ষেত্র এখনও অমিমাংসিত রয়েছে তাও প্রায় ৬.৫ কিমি। ত্রিপুরার ফেনি নদীর মাতামুহুরি চর অমিমাংসিত থেকে যায়।[২৩] ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ছিটমহল দহগ্রাম ও অঙ্গারপোতার সমাধান কিন্তু হয় নি, তা আজও বাংলাদেশের ছিটমহল আর তার সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা তিনবিঘা করিডোর। ৩১শে জুলাই পারস্পারিক ছিটমহলগুলি বিনিময়ের আগে উভয় দেশের ছিটমহলেই সমীক্ষা চালান হয়, তাতে দেখা যায় ১৩ই জুলাই বাংলাদেশের ভেতর ভারতীয় ছিটমহলের ১০০টি পরিবারের ৯৯৪ জন ভারতের বাসিন্দা হওয়ার আবেদন জানায়। ঠিক করা হয় ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ভারতে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে বুরিমারি, হলদিবাড়ি, সাহেবগঞ্জ সীমানা দিয়ে। ভারতের ভেতরে অবস্থিত বাংলাদেশী ছিটমহল থেকে কেউ বাংলাদেশ যেতে চায়নি। ৩১ শে জুলাই ২০১৫ দিনটি ছিল ছিটমহলের অধিবাসীদের জন্য স্বাধীনতা দিবস। দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রহীন অবস্থায়, চরম বেদনায় যে দিনপাত করেছে এই তারিখটি ছিল তার শেষদিন। সরকারি তরফে কোন অনুষ্ঠান না করা হলেও উভয় দেশের ছিটমহলের মানুষের মধ্যে ছিল আনন্দ ও আত্মতৃপ্তির ছাপ।

ছিটমহল বিনিময়ের পরবর্তী জীবন

দীর্ঘকাল যাবৎ নাই দেশের বাসিন্দা ছিটমহলের মানুষেরা যখন দেশ পায় তখন ভারতের সাথে যুক্ত নব্যনাগরিক হিসাবে যোগ হয়েছিল ১৪২১৫ জন ও তারসঙ্গে ৯৯৪ জন আর বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ৩৭২৬৯ জন। বাংলাদেশের সরকার এই নব্য নাগরিকদের জন্য বরাদ্দ করা অর্থের ঘোষণা ছিল দুশো কোটি টাকা আর ভারত সরকারের তা ছিল একহাজার তিনশো কোটি টাকা। ভারতে যে ৯৯৪ জন ছিটমহলবাসী নাগরিকত্ব নিয়েছিল তাঁদের বসবাসের জন্য দিনহাটা, মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়িতে তিনটি অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরি করা, আর এই ক্যাম্পের ঘরগুলো ছিল দুকক্ষ বিশিষ্ট টিন শেড। এরই মধ্যে ছিটমহলে পুনর্বাসনকে কেন্দ্র করে বার বার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়িতে পুনর্বাসনের যে জমি কেনা হয় তাতেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠে প্রায় এক কোটি টাকারও বেশি।[২৪] বছরের পর বছর গেলেও উন্নতির ছাপ তেমন পরেনি নতুন এই নাগরিকদের ওপর। বসত জমির কাগজপত্র পর্যন্ত তারা পায়নি, ফলে মুম্বাইয়ের নয়ডায় কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশী সন্দেহে গ্রেফতার হয় এক ছিটবাসী ভারতীয় নাগরিক। নানান সমস্যার মধ্যেও বলা যায় পূর্বের তুলনায় ছিটমহলবাসী ভারতের নাগরিক অন্যদিকে বাংলাদেশের নাগরিক হওয়াতে দীর্ঘকালীন এক সমস্যা থেকে মুক্তি পায়।

উপসংহার

ভারত পৃথিবীতে আয়তনের দিক দিয়ে সপ্তম বৃহত্তম স্থান দখল করে রয়েছে। ভারতের তিনদিকে অবস্থিত সমুদ্রকে বাদ দিলেও স্থল সীমান্ত রয়েছে পাকিস্তান, আফগানিস্থান, চীন, নেপাল, ভূটান, মায়ানমার ও বাংলাদেশের সঙ্গে। এদের মধ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে রয়েছে চার হাজার কিমি সীমান্ত। ছিটমহলের উত্থান ও বিবর্তন তার মধ্যে দেশভাগ দীর্ঘকাল ধরে ভারতের মধ্যে নানান সীমান্ত সমস্যা সৃষ্টি করে আসছে। প্রথমে ভারত-পাকিস্তান ও পরে ভারত-বাংলাদেশ একাধিকবার চেষ্টা করেছে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য। ১৯৫৮তে নেহরু-নুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েও বেরুবাড়ি সমস্যা প্রধানমন্ত্রীকে জহরলাল নেহরুকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধ সীমান্ত সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তোলে, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধ ও ভারতের তাতে অনশগ্রহন এবং পরিশেষে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম সীমান্ত সমস্যাকে কিন্তু শেষ করতে পারে নি। পরের বছর ১৯৭২ সালে নব বাংলাদেশের নব প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ভারতের ইন্দিরা গান্ধীর এক বাণিজ্যিক চুক্তি হলেও সীমান্ত বিষয়টি কেন আসেনি তা ভাববার বিষয়। তবে ১৯৭৪ সালেই সীমান্ত সংক্রান্ত বিখ্যাত চুক্তি হয় ইন্দিরা গান্ধি ও মুজিবুর রহমানের মধ্যে। দুঃখের বিষয় তিনবিঘা করিডোর সমস্যা নিয়ে তাও কালের গ্রাসে হারিয়ে যায়। অবশেষে নানান উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে ২০১৩ সালে রাজ্যসভায় সংবিধান সংশোধনী বিল উত্থাপন ও সংসদের উভয় কক্ষে তার পাশ হওয়া ছিটমহলবাসীদের মধ্যে স্বস্তির হাওয়া এনে দিয়েছিল। শুধুমাত্র ছিটমহলের সমস্যা সমাধানের জন্য সংবিধান দুবার সংশোধন করতে হয়, তাহল ৯ম ও ১১৯তম সংশোধন। বিনিময় যোগ্য ছিটমহলের মধ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ভারতের ১১১টি ছিটমহলের আয়তন ছিল ১৭ হাজার ১৬০ একর, অপরদিকে ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহলের আয়তন হল ৭১১০ একর। অর্থাৎ শুধুমাত্র প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের জন্য ভারতকে হারাতে হয়েছিল ১০হাজার একর জমি, শান্তিকামী ভারতের এর থেকে আর বড় নিদর্শন আর কি হতে পারে।

তথ্যসূত্র নির্দেশিকা

১. রামায়ণী বাংলা অভিধান, শ্রী সুধাংশুশেখর গুপ্ত, রামায়ণী প্রকাশ ভবন, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা, পৃ- ২৬৫।

২. ইভজেনি ভিনোকুরভ, *এ থিয়োরি অব এনক্লেভস*, লানহাম, ২০০৭, পৃ-২৩।

৩. খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ, *কোচবিহারের ইতিহাস*,পুনর্মুদ্রণ ২০০৮,কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ- ১১৬।

৪. *তদেব*, পৃ- ২৬৬।

৫. দেবব্রত চাকী, *ব্রাত্যজনের বৃত্তান্তঃ প্রসঙ্গ ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল*, সোপান, কলকাতা-৬, পৃ- ৩৩।

৬. *তদেব*, পৃ- ৩৪।

৭. Aljazeera, তারিখ- ০৬/০৯/২০১১

৮. ব্রেনড্যান আর হোয়াইট, *ওয়েটিং ফর দ্যা এসকুইমো*, ডক্টরেট থিসিস পেপার, ইউনিভার্সিটি অব মেলবোর্ণ, ২০০২, পৃ- ৪৬।

৯. *দ্যা ক্যালকাটা গেজেট*, ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬, পার্ট-১, পৃ- ১২২২।

১০. ব্রেনড্যান আর হোয়াইট, *ওয়েটিং ফর দ্যা এসকুইমো*, ডক্টরেট থিসিস পেপার, ইউনিভার্সিটি অব মেলবোর্ণ, ২০০২, পৃ- ৪৯।

১১. মাধুরী পাল; *র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারা, ছিটমহল ও সীমান্ত সমস্যার উৎপত্তি*, ইতিহাস অনুসন্ধান- ১৯, সম্পাদনা- অনিরুদ্ধ রায়, ২০০৫; পৃ- ৩২৯।

১২. দেবব্রত চাকী, *ব্রাত্যজনের বৃত্তান্তঃ প্রসঙ্গ ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল*, সোপান, কলকাতা-৬, পৃষ্ঠা- ৪৫।

১৩. আনন্দবাজার পত্রিকা, তারিখ ০১/০৮/২০১৫

১৪. আনন্দবাজার পত্রিকা, তারিখ ১১/১২/২০১৪

১৫. ব্রেনড্যান আর হোয়াইট, *ওয়েটিং ফর দ্যা এসকুইমো*, ডক্টরেট থিসিস পেপার, ইউনিভার্সিটি অব মেলবোর্ণ, ২০০২, পৃ- ৯৬।

১৬. "The Double Game"- The New Yorker, 8th May 2011.

১৭. "Stateless in South Asia: The Making of the India-Bangladesh Enclaves, The Journal of Asian Studies 61, p—138.

১৮. Hariram Gupta, *India-Pakisthan War 1965*, Vol-01 by, Hariya Prakasan. p- 315.

১৯. ব্রেনড্যান আর হোয়াইট, *ওয়েটিং ফর দ্যা এসকুইমো*, ডক্টরেট থিসিস পেপার, ইউনিভার্সিটি অব মেলবোর্ণ, ২০০২, পৃ- ১৩৪।

২০. সি এন এন- আই বি এন, তারিখ- ০৭/০৯/২০১১।

২১. এন ডি টি ভি, তারিখ- ০৬/০৬/২০১৫।

২২. আনন্দবাজার পত্রিকা, তারিখ- ২০/০৩/২০১৫।

২৩. উত্তরবঙ্গ সংবাদ, তারিখ- ০১/০৮/২০১৫।

২৪. আনন্দবাজার পত্রিকা, তারিখ- ১৮/০৬/২০১৭।

স্বাধীনোত্তর মালদা জেলার মুসলিম নারীর শিক্ষাগত অবস্থানঃ একটি সমীক্ষা (১৯৪৭-২০১১)

ইয়াসমিন রেজা
গবেষিকা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ:

দেশ,সমাজ ও জাতির উন্নতির জন্য নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ভারতের দ্বিতীয়বৃহত্তম ও প্রথম সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের অর্ধেক হচ্ছে নারী। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নারী শিক্ষা বিশেষত মুসলিম নারীর শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হলেও স্যাচার কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে মাত্র চার পার্সেন্ট মুসলিম জনগণ শিক্ষিত এবং এটি দেশের অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে সবথেকেপিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়। ২০১১ মুসলিম জনসংখ্যা হল ৫১.২৭% যেখানে মুসলিম নারী শিক্ষার হার ৫৭.২০% এবং মুসলিম পুরুষ শিক্ষার হার ৬৬.৮০%। বর্তমান প্রবন্ধটির উদ্দেশ্যই হলো স্বাধীনতার পরবর্তীকালে মালদা জেলার মুসলিম নারীর শিক্ষাগত অবস্থান পর্যালোচনা করা ও তাদের পিছিয়ে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করা।

শব্দ সূচক: মুসলিম নারী, ইসলাম ধর্ম, শিক্ষার হার, স্কুলছুট।

সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো শিক্ষা। এটি একটি অপ্রতিরোধ্য চলমান পদ্ধতি। একটি ব্যক্তি জন্ম লগ্ন থেকে আমৃত্যু জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সমাজ ও সভ্যতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। তবে মূলত পড়তে ও লিখতে জানার সক্ষমতাকেই শিক্ষার মাপকাঠি ধরা হয়। এই শিক্ষা বা এডুকেশন শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Educare থেকে যার অর্থ ওপরে ওঠা জাগ্রত হওয়া ইত্যাদি। আধুনিক শিক্ষা সামাজিক সক্রিয়তা ও অবস্থান পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিকে বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার সাথে অভিযোজিত হতেই শেখায় না বরং প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে মুক্তমনা হতেও শেখায়।একটি দেশের অর্ধেক অংশ যেহেতু নারী। তাই নারী শিক্ষা ব্যতীত দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি অসম্ভব। একটি নারী শিক্ষিত হলে সে সমগ্র পরিবার ও সমাজের কল্যাণ ও উন্নতির সহায়ক। সর্বধর্ম সমন্বয়ের মিলন ভূমি ভারতবর্ষের বৃহত্তম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হল মুসলিম। এই বিষয়ে ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্পন্ন মুসলিম জনসংখ্যার অর্ধেক নারীর শিক্ষা ও অগ্রগতির সম্পর্কে পর্যালোচনা প্রয়োজন। মুসলিম নারী শিক্ষা সাধারণত দুইভাবে হয়ে থাকে প্রথমত: ধর্মীয় শিক্ষা যা শুধুমাত্র কোরআন ও হাদিস কেন্দ্রিক দ্বিতীয়তঃ নিরপেক্ষ শিক্ষা যা আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি দ্বারা গৃহে বা বিদ্যালয়ের সম্পন্ন হয়ে থাকে।[১] ২০১১ আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে জাতীয় শিক্ষার হার ৭৪% নারী শিক্ষার হার ৬৫% এবং মুসলিম নারী শিক্ষার হার ৫১.৮৯%, যা অন্যান্য সম্প্রদায়ের নারী শিক্ষার হারের থেকে অনেক কম। ২০১১ সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার হার ৭৭.০৮ শতাংশ নারী শিক্ষার হার ৭১ শতাংশ। শিক্ষার অগ্রগতির সাথে সাথে মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মীয় সামাজিক সম্প্রদায়ের শিক্ষাগত ব্যবধান প্রকট হয়েছে। সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে মুসলিম জাতির সাথে অন্যান্য সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের শিক্ষার গত ব্যবধান বৃদ্ধির কারণ হলো মুসলিমরা পরিবর্তিত অবস্থার সাথে নিজের শিক্ষাগত অবস্থানের উন্নতি ঘটাতে পারেনি।যদিও বা কিছুটা মুসলিম জাতির শিক্ষার উন্নতি ঘটেছে কিন্তু তা অন্যান্য ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক ধীরগতিতে।[২]

লিঙ্গ বৈষম্য ভারতবর্ষের বহু যুগ ধরে চলে আসা একটি সামাজিক ব্যাধিস্বরূপ। গৃহ, কর্মক্ষেত্র,শিক্ষা জগত সর্বত্র নারী পুরুষের মধ্যে অসাম্য প্রচন্ডভাবে প্রকটমান। প্রাচীন যুগের মত বর্তমানেও ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। মুসলিম সমাজব্যবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। নারী পুরুষের এই অসম বৈষম্য শিক্ষাক্ষেত্রেও দৃশ্যমান। ২০০১ এর সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে পুরুষ শিক্ষার হার ৭৫%, সেখানে নারী শিক্ষার হার ৫৪.১৬%। ২০১১ সেন্সাস অনুযায়ী পুরুষ শিক্ষার হার ৮২.১৪% এবং নারী শিক্ষার হার ৬৫%, যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয়। যেখানে নারী সর্বদাই অবহেলিত, বঞ্চিত শ্রেণী হিসেবে বিবেচিত হয়।

ইসলাম হলো প্রকৃত জীবন দর্শন।ইসলামে শিক্ষার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইসলাম ধর্ম কখনোই শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ করে না। হযরত মুহাম্মদ উল্লেখ করেছেন 'The pursuit of knowledge is a duty of every Muslim men and women'[৩] ইসলামে উভয়কেই জ্ঞান অর্জনের উৎসাহী করা হয়। ইসলামে বলা হয় শহীদের রক্ত অপেক্ষা আলিমের কালির জোর অনেক বেশি।[৪] ইসলামের শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলা হয় শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রয়োজন হলে সুদূর চীনদেশেও পাড়ি দিতে হবে। ইসলাম ধর্ম মনে করা হয় জ্ঞান অর্জন শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির জন্য নয় সমগ্র বিশ্বের সামগ্রিক উন্নতির জন্য অবশ্যই প্রয়োজন। ইসলাম নারী শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রত্যেক পিতা-মাতাকে নির্দেশ দিয়েছে তোমরা তোমাদের কন্যা সন্তানদের শিক্ষা দাও যাতে তারা ঠিক ভুলের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারে।[৫] প্রাক-ইসলাম পূর্বে সমাজে নারীর অবস্থা ছিল অমর্যাদাকর। কন্যা সন্তানকে প্রচন্ড অবহেলা ও বঞ্চনার মধ্য দিয়ে জীবন কাটাতে হতো। এমনকি কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো দৃষ্টান্ত প্রাক ইসলাম পর্বে আরব সাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল। ইসলাম আবির্ভাবের পর অবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকে, সমাজে নারীর মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং নারী-পুরুষ ইসলামের দৃষ্টিতে সমমর্যাদা সম্পন্ন হতে থাকে। ইসলামে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের শিক্ষার অধিকার থাকলেও বর্তমানে বিভিন্ন মৌলানা মৌলভীদের ভুল ব্যাখ্যা সমাজে নারী পুরুষের ভেদাভেদ সৃষ্টি করে এবং সমাজে নারীর মর্যাদা হীন করে। মুসলিম নারীর পিছিয়ে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে যাদব বলেছেন ইসলাম অপেক্ষা সামাজিক কারণ যেমন পর্দাপ্রথা, পরিবারের পুরুষ সদস্য ও ধর্মের ব্যাখ্যা কর্তাদের নারী শিক্ষার প্রতি অনীহা, মেয়েদের ছেলেদের সাথে এক স্কুলে পড়তে অনিচ্ছা প্রকৃতি বিশেষভাবে দায়ী। তবে বর্তমানে চিত্র বদলেছে।[৬] ভারতের সংবিধানেও মুসলিম নারীদের শিক্ষার সমান সুযোগ দিয়েছে তা সত্ত্বেও মুসলিম নারীরা শিক্ষাগত দিক থেকে পশ্চাদপদ। বর্তমান প্রবন্ধটির উদ্দেশ্যই হল মালদা জেলার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম নারীর শিক্ষাগত পশ্চাদপদতার কারণ অনুসন্ধান বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা এবং তার সমাধান নির্দেশ করা।

স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশে নারী শিক্ষার উন্নতির জন্য বিভিন্ন শিক্ষা কমিটি কমিশন ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা বিষয়ক কতগুলি সুপারিশ নেওয়া হয়। স্বাধীনতার পর শিক্ষাক্ষেত্রে এবং কর্মজীবনে নারীরা যাতে পুরুষদের সমান অধিকার লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করাই ছিল এইসব কমিশন গুলির মূল উদ্দেশ্য। স্বাধীন ভারতের সংবিধানেও এদের পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। জীবন নির্বাহের ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে চার দেয়ালের গণ্ডি পেরিয়ে বেরিয়ে এসেছে। সুযোগ পেলে শিক্ষার আলো পেলে সে তার অবরোধবাসিনী জীবন পেছনে ফেলে সমাজের উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রেই সমান অংশীদার হয়ে উঠতে পারবে। শিক্ষা বিষয়ক কমিটি ও কমিশন গুলি নারী শিক্ষার উন্নতিতে কতটা সহায়ক হয়েছে তা খতিয়ে দেখা যাক। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ভারত সরকার উচ্চ শিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-৪৯) গঠন করেন। এই কমিশন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে সহশিক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ প্রদান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, মেয়েদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা, পুরুষ শিক্ষক ও নারী শিক্ষিকাদের সমাহারে বেতন প্রদান প্রভৃতি সুপারিশ করে। ১৩ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত ছেলে মেয়েদের পৃথক বিদ্যালয়ের সুপারিশ করে যদিও কলেজের স্তরে সহশিক্ষার সমর্থনের মত প্রকাশ করেছে।[৭] মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়ার কমিশন (১৯৫২-৫৩) এর চতুর্থ অধ্যায় নারী শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বিদ্যালয় স্তরে সহশিক্ষার সমর্থন করে, পুরুষ ও নারী শিক্ষার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। এই কমিশন সুপারিশ করেছে যে ছেলেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মত মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও অধিক সরকারি অর্থ সাহায্য দিতে হবে এবং মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্যবিদ্যা, সংগীত, অঙ্কন ও মুদ্রণশিল্প, নার্সিং ও সেলাই প্রভৃতি পড়ানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।[৮]

১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধান কার্যকরী হওয়ার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী শিক্ষার সম্বন্ধে আলোকপাত করার জন্য শ্রীমতি দুর্গা ভাই দেশমুখে নেতৃত্বে ১৯৫৮ সালে মহিলা শিক্ষার সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি ন্যাশনাল কমিটি এডুকেশন স্থাপন করা হয় ও ভারতীয় নারীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুপারিশ করেন। এই কমিটি নারী শিক্ষার বিষয়ে কতগুলি প্রস্তাব করে যেমন, প্রাথমিক স্তরে স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে, নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে বিষয়গুলির বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালাতে হবে, নারী ও পুরুষের শিক্ষার মানের ব্যবধান দূর করতে হবে, প্রয়োজন অনুযায়ী মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে, গ্রাম এলাকায় ছেলেমেয়েদের আলাদা স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে, মেয়েদের পড়াশোনার জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করতে হবে। নারী শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য নারী শিক্ষা পর্ষদ (National Council for Women Education) ১৯৫৯ সালে শ্রীমতি দুর্গা ভাই দেশমুখের সভাপতিত্বে গঠিত হয়।[৯] ১৯৬১ সালে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ওমেন এডুকেশন এর নির্দেশে ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের পরামর্শক্রমে হংস মেহেতার সভাপতি হংস মেহেতা কমিটি গঠিত হয় এই কমিটি মূলত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যক্রম সম্পর্কে সুপারিশ করে। কমিটির মতে প্রাথমিক স্তরের ছেলেমেয়েদের পাঠ্যক্রমের কোন বিভেদ থাকা উচিত নয়এবং প্রাথমিক স্তরে সহ শিক্ষার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করে। এছাড়াও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

বেশি সংখ্যক মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগের কথা বলা হয়, ১৪ বছর পর্যন্ত সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং মাধ্যমিক স্তরে ছেলেমেয়েদের পাঠ্যক্রমে বৃত্তি শিক্ষার উপরও গুরুত্ব দিতে হবে বলে কমিটি সুপারিশ করে।[১০]

১৯৬৪-৬৫ সালের গঠিত কোঠারি কমিশন নারী শিক্ষার বিস্তারে ও সমস্যাবলী সমাধানের সুপারিশ করে। কমিশনের মতে নারী শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্য রাজ্য ও কেন্দ্র এবং সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগকে একত্রে এগিয়ে আসতে হবে। প্রাথমিক স্তরে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু, মেয়েদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বৃত্তির ব্যবস্থা, আংশিক পাঠ্যক্রম ও বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম, ছাত্রীদের আবাসের ব্যবস্থা প্রভৃতি করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের অনুপাত ৪:১ থেকে ৩:১ নিয়ে আসতে হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন রকম তারতম্য থাকা উচিত নয় বলে কমিশন মনে করে।[১১] নারী শিক্ষার বিষয়ে জনগণের অনীহার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় মহিলা শিক্ষা পরিষদ শিক্ষা পর্ষদ তৎকালীন মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম ভক্ত বৎসলের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে যা ভক্ত বৎসল কমিটি নামে পরিচিত। এই কমিটি নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারি বেসরকারি এবং কেন্দ্র ও রাজ্যর যুগ্ম উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। এই কমিটি নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য মেয়েদের বিদ্যালয় ভবনের উন্নতি, ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই খাতা ও পোষাক দেওয়ার সুপারিশ করে। শিক্ষিকাদের বিশেষ প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা ও বিদ্যালয় স্তরে বেশি সংখ্যক মহিলা শিক্ষক নিয়োগেরও সুপারিশ করে এই কমিটি।[১২] ১৯৬৮ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয় নারী শিক্ষার অগ্রগতি ব্যতীত সমাজের আমূল পরিবর্তন অসম্ভব। এই শিক্ষানীতি নারী শিক্ষার প্রসার, শিক্ষাক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা, শিক্ষার মান উন্নয়ন, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও কৃষিবিদ্যার প্রসার, সামাজিক ও নৈতিকতা বৃদ্ধিপ্রভৃতির সুপারিশ করে।[১৩]

বিংশ শতকের শেষ পর্যায়ে সর্বত্র নারী আন্দোলন, নারী অধিকারের লড়াই শুরু হয়। জাতিসংঘ ১৯৭৫-৮৫ সাল সময়কালকে নারী দশক বলে ঘোষণা করে।[১৪] ১৯৭৫ সালে ভারত সরকার নারী শিক্ষার অগ্রগতির উপর বেশি মনোযোগ প্রদান করে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামো পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং বলা হয় সঠিক শিক্ষানীতির অভাবে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বাধিক মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, জীবিকাভিত্তিক শিক্ষার ওপর জোর দেয়। এতে নারী ও উন্নতি (Women and Development) বিষয়ক একটি অধ্যায় সূচিত হয়েছে যা শুধুমাত্র নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবিকার উপর আলোকপাত করে বেশী মাত্রই মেয়েদের স্কুলের নাম নথিভুক্তকরণ, স্কুল সময়ের বাইরে জীবিকাভিত্তিক শিক্ষা চালু, বিদ্যালয়গুলিতে বিশেষ করে গ্রাম্য এলাকায় অধিক মাত্রায় মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগ, শিক্ষিকাদের জন্য আবাসের ব্যবস্থা, মেয়েদের বিদ্যালয় ও কলেজ গুলিতে বিজ্ঞান বিভাগ তৈরি করা, মহিলাদের পেশাদারী শিক্ষা যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স, পশু চিকিৎসা বিদ্যা, ফরেস্ট্রি প্রভৃতি শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলা। যেখানে নারী সাক্ষরতার হার কম সেখানে সাক্ষরতা অভিযান চালানো, সহশিক্ষায় উৎসাহ প্রদান ও অনগ্রসর জাতির ছাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি সুপারিশ করা হয়।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০) এ নারী শিক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়। ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষা নীতিতে মেয়েদের নিরক্ষরতা দূর করতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করেতোলা, বিভিন্ন বৃত্তিমূলক বা আধুনিক পেশার মহিলাদের প্রবেশাধিকারের ওপর জোর দেওয়া হয়। ১৯৮৬ শিক্ষানীতির সাথে যুক্ত প্রোগ্রাম অফ একশন (POA) নারী ক্ষমতায়ন, নারীর আত্মবিশ্বাস ও মনোবল বৃদ্ধির উপর সতর্ক দৃষ্টিপাত করে।[১৫] অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে না পারায় নবম পরিকল্পনার শেষে ২০০১ সালে সর্বশিক্ষা অভিযানের (SSA) নীতি গৃহীত হয়। সর্বশিক্ষা অভিযানের একটি অবিচ্ছেদ অঙ্গ বাধ্যতামূলক শিক্ষা নীতি ঘোষণা করা হয়। তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ৬-১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বিদ্যালয়ে নিম্নস্তরে বাধ্যতামূলক শিক্ষা। ২০১০ সালের মধ্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব বালক বালিকাদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া। সর্বশিক্ষা অভিযানের একটি আরও একটি অবিচ্ছেদ অঙ্গ ছিল স্কুলছুট বালক বালিকাদের বিদ্যালয়গামী করে তোলা। দরিদ্র শ্রেণীর বালক বালিকাদের বিদ্যালয়মুখী করার জন্য ১৯৯৫ সালে দ্বীপ্রাহরিক খাবার বা মিড ডে মিল দেওয়ার নীতি গৃহীত হয়েছিল যার ফলস্বরূপ ২০০৪ সালে থেকে প্রত্যেক সরকারি বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী প্রতিটি বালক বালিকার জন্য মধ্যাহ্নভোজনের নীতি গৃহীত হয়। একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের সুপারিশ গুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির এবং নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটনো, নারীদের শিক্ষার আঙিনাই আনার জন্য বহুল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সুপারিশ করা হয়েছে গ্রামাঞ্চলে বিশেষত অনুন্নত সম্প্রদায়, শিক্ষায় বঞ্চিত সম্প্রদায়ের অবিলম্বে নানা সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষত্ব নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য বিদ্যালয় বালিকাদের বিদ্যালয়েরমুখী করা প্রয়োজন। মুসলিম অনুন্নত এলাকায় যেখানে বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার অপেক্ষাকৃত কম সেই সব অঞ্চলগুলোর প্রতি অধিক নজর দেওয়া এবং শিক্ষার উপযোগিতা ও সুবিধাসমূহের পর্যালোচনা করে সেসব সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে তাদের বিদ্যালয়ের মুখী করে তোলা। একাদশ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হয়েছিল ১৪ বছর পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান করা।[১৬]

পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলির মধ্যে অন্যতম হলো মালদা জেলা প্রাচীন ও মধ্যযুগের গৌড় ও পান্ডুয়াকে কেন্দ্র করে ইংরেজবাজার ও মালদা জেলা গড়ে উঠেছিল। তবে বাস্তবিকভাবে মালদহ জেলার আবির্ভাব ঘটে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চার্টার অনুসারে।[১৭] ১৮১৩ সালের ১৫ টি থানা নিয়ে প্রশাসনিকভাবে মালদহ জেলা গঠিত হয়। তৎকালীন পূর্ণিয়া জেলা থেকে পাঁচটি থানা কালিয়াচক, খরবা, গৌড়, গারিবা, ভোলাহাট, শিবগঞ্জ কেটে মালদার সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। এর উত্তরের অঞ্চল জঙ্গলে ভর্তি অনুন্নত। স্বাভাবিকভাবেই উত্তর মালদার তুলনায় দক্ষিণ মালদা অগ্রসর উন্নত ছিল। মালদার পার্শ্ববর্তী ভাগলপুর, রাজমহল, দিনাজপুর, রাজশাহী বহু এলাকার সংমিশ্রণের ফলে মালদার ভাষা সংস্কৃতি প্রভৃতিতে এর প্রভাব পড়ে এক মিশ্র সংস্কৃতের সৃষ্টি হয়। এই মিশ্র সংস্কৃতি মালদার নারী শিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করে ব্রিটিশ শাসনের দিন মালদার শিক্ষা বিস্তার পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, প্রথমদিকে প্রাথমিকভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের শিক্ষা

প্রসারের ব্যাপারে তেমন উদ্যোগী ছিল না। ১৮১৩ এর চার্টার পর থেকে ভারতের শিক্ষা খাতে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তারই সূত্র ধরে মালদাহে শিক্ষার প্রসার ঘটতে শুরু করে।অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের মালদা জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা সাধারণত ইংরেজ কর্মচারীদের বিবরণ থেকে জানতে পারি। প্রথম দিকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ দেশীয় ভাষাতেই শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী ছিল। দেশীয় ভাষায় শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে মিশনারী সদস্য উইলিয়াম কেরি মদনা বতিতে ৪০ জন ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। উনিশ শতকের প্রথম দিকে হ্যামিলটন বুকানন মালদা আসেন। হ্যামিলটনের সার্ভে (১৮১০) থেকে মালদহ জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যায়। তিনি উল্লেখ করেছেন প্রত্যেক গ্রামে পাঠশালা উপস্থিত ছিল। এই পাঠশালাগুলির প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র রূপে কাজ করতো এবং যারা শিক্ষা দিত তাদের গুরু বলা হতো।[১৮] সেই সময় হিন্দু ছাত্ররা টোল ও মুসলিম ছাত্ররা মক্তব মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত। মাদ্রাসায় ফারসি ভাষা সাহিত্য ও ইসলামীয় ধর্ম শাস্ত্র পাঠ করত।

১৮৫৪ সালের উডের ডেসপ্যাচ অনুসারে ভারতের সর্বত্র প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার রূপরেখা তৈরি হয়। এই নির্দেশ অনুসারে কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন জেলায় সরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের সূত্র ধরে ১৮৫৮ সালে মালদা জেলার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই স্কুল চালানোর শীর্ষে থাকবেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।[১৯] মালদা জেলায় স্কুল সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় সরকারি স্কুলের সংখ্যা খুব কম ছিল। কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সেক্রেটারি হেনরি উড জেলা স্কুলের একজন পন্ডিত নিযুক্ত করেন যার মাসিক বেতন ছিল পনেরো টাকা। মাত্র ৪০ জন ছাত্র নিয়ে মালদা জেলা স্কুলের পথ চলা শুরু হয়। জেলা স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় থেকে মালদাহের বিভিন্ন জায়গায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বহু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। মালদা শহরের দুটি ও পুরনো মালদাতে একটি এবং আড়াইডাঙ্গা, চাচোল ও মথুরাপুরে একটি বিদ্যালয়ের স্থাপিত হয়।[২০] তবে নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার তেমন ঘটেনি। ১৮৬০-৬১ সালে মালদহ জেলার ইংরেজি মাধ্যম স্কুল প্রতিষ্ঠা শুরু হয়। ১৮৭০-৭১ সালে একটি ইংরেজি স্কুল ও তিনটি দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের স্কুল খোলা হয়েছিল। তাছাড়া তিনটি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ইংরেজি ও দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য এগারোটি স্কুল খোলা হয়েছিল।

উনিশ শতকে বাংলায় নারী শিক্ষার প্রসার ঘটতে শুরু করে। তারই সূত্র ধরে মালদহে সংস্কারপন্থীরা ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মালদহে নারী শিক্ষার ইতিহাসে এটি নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কুসংস্কার পন্থীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ৪২ জন হিন্দু ও ছয় জন মুসলিম ছাত্রী নিয়ে মালদা গার্লস স্কুল শুরু হয়। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রূপে স্বীকৃতি লাভ করে এই বালিকা বিদ্যালয়। মালদা জেলা এর সময়ে ভাগলপুর ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ডিভিশনাল কমিশনার জি এস বার্লো মারা গেলে তার স্মৃতি রক্ষার্থে কয়েকজন ইংরেজি অনুরাগী মালদা শহরবাসী বার্লো মেমোরিয়াল কমিটি গঠন করেন। কমিটির উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্থ সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ের জন্য একটি বড় হলঘর প্রতিষ্ঠা করা। ১৮৮৭ সালে স্কুল কর্তৃপক্ষ কমিটির কাছে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করলে বার্লো মেমোরিয়াল কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে মাননীয় বার্লো সাহেবের স্মৃতি রক্ষার্থে সংগৃহীত অর্থ মালদা গার্লস স্কুলকে শর্তসাপেক্ষে দান করেন। শর্তানুযায়ী স্কুলটির নাম পরিবর্তন

করে বার্লো গার্লস স্কুল রাখা হয়।[২১] স্কুলটি প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে শুরু হয়েছিল। পরে ১৯৯২ সালে এটি মিডিল ইংলিশ স্কুল এবং ১৮৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক হাই স্কুলের অনুমোদন পায়। ১৮৮৮ সালে আরো একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার নাম চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশন। চাঁচল রাজা শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী তার মায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে এই স্কুলটি স্থাপন করেন। এই স্কুলের ব্যয়ভার চাঁচল রাজ স্টেট এর দ্বারা চালিত হত। পরে ১৯৩৮ সালে এটিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক হাই স্কুলের অনুমোদন পাই।[২২]

১৯০৫ সালে ভারতের সর্বত্র বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে সর্বত্র জাতীয় শিক্ষা সমিতি গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৬০ সালের ৬ জুন মালদা জাতীয় শিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সমিতি কর্তৃক কলিগ্রাম, কুতুবপুর, ধরমপুরে প্রাথমিক ও নৈশ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।[২৩] কারিগরি শিক্ষার প্রসারেও সমিতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের যুগের স্বদেশী ভাষায় শিক্ষার প্রসার ঘটলেও পরবর্তীকালে তাতে কিছুটা ভাটা পড়ে যায় এবং ইংরেজি শিক্ষার জোয়ার আসে।১৯৩৮ সালের মকদমপুরে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ইংলিশ বাজার এম এম ই স্কুল নামে পরিচিত। ১৯৪৮ সালে এর নাম পরিবর্তন করে মালদা টাউন এইচ ই স্কুল করা হয়। ১৯৪৯ সালে স্কুলটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক হাই স্কুলের অনুমোদন পাই।[২৪]

মালদা জেলায় হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতি কম ছিল। G.E. Lambourne তার মালদা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিআরে উল্লেখ করেছেন মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষত শেরশাহবাদিয়ারা কোন ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার বিরোধী ছিল।[২৫] হিন্দু জমিদাররা যেভাবে শিক্ষার অগ্রগতিতে এগিয়ে এসেছিল মুসলিম জমিদাররা ততটা আগ্রহ প্রকাশ করেনি। পরে এর পরিবর্তন ঘটে, মুসলিমদের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য ১৮৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মালদহ মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন। ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মালদা মডেল মাদ্রাসা এবং আব্দুল গনি সাহেব এর সম্পাদক নিযুক্ত হলেন।প্রথমে এটি স্থাপিত হয় মিরচকে পরে এর বর্তমান অবস্থানে স্থানান্তরিত করা হয়। মালদার মুসলমান সমাজ প্রথম দিকে নারী শিক্ষার বিরোধী ছিল শুধুমাত্র পুরুষ সন্তানদের বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য পাঠানো হত। নারীদের জন্য কেবলমাত্র ধর্মভিত্তিক ইসলামীয় শাস্ত্রীয় শিক্ষা ধার্য করেছিল এবং গৃহ ছিল তাদের একমাত্র স্থান। উনিশ শতকের শেষের দশকে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটলে মালদহের কতীপয় শিক্ষিত ও প্রগতিশীল মানুষ মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগী হন। নারী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায় মক্তব, মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল। ইংরেজবাজার শহরের মুসলিম সমাজ বালিকাদের শিক্ষা প্রসারে উৎসাহী হয়। মীরচক, ফুলবাড়ী প্রভৃতি মহল্লায় মুসলিম লোয়ার প্রাইমারি মক্তব ও ইসলামিয়া আপার প্রাইমারি মক্তবে মুসলিম ছাত্ররা পড়াশোনা করত। ১৯১৬ সালের ডঃকাজী আজহারউদ্দিন জালালিয়া গার্লস নামে মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃতপক্ষে বিবিগ্রাম, হায়দারপুর, মহেশমাটি প্রভৃতি এলাকার মুসলিম মেয়েরা এখানে পড়াশোনা করতে আসে। এই মক্তবের ব্যয়ভার ওয়াকাফ সম্পত্তির দ্বারা চালিত হত। জালালিয়া গার্লস মক্তবে ছাত্রীদের বেতন লাগত না, পঠন-পাঠন ব্যবস্থা, উন্নত পাঠ্যক্রম প্রভৃতি নানা দিক থেকে পার্থক্য দেখে মুসলিম সমাজ আকৃষ্ট হন। বাল্যবিবাহের

যুগে অনেক বিবাহিত বালিকা বধূ ও এই মক্তবে পড়তে আসত।[২৬] ১৯৩৫ সালে জালালিয়া মক্তব শিক্ষার জন্য ইম্পেরিয়াল গ্রান্ড পায়।

১৯৩২ সালে আইহো গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা আব্দুস সোবহান শাহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার জন্য এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ছাত্রীদের সচেতন করার জন্য একটি দিন পরিচ্ছন্নতা দিবস হিসেবে পালিত হত।[২৭] মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য মৌলভী আব্দুল গনি মিরচক, বামন গ্রাম, চন্ডিপুর, বিরুয়া, চামাগ্রাম প্রভৃতি জায়গায় জনসভা করে সচেতন করার চেষ্টা করেন। সেই সময়ে বার্লোগার্লস স্কুল থেকে তিনজন ছাত্রী ম্যাট্রিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। এরা হলেন হাসিনা খাতুন, আমিনা খাতুন ও জবা খাতুন।[২৮]

মালদা কলেজ প্রতিষ্ঠা মুসলিম ছাত্রীদের শিক্ষার প্রসারের পথকে আরো সুগম করে দেয়। মালদা কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম সানাউল্লাহ হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি মুসলিম ছাত্রীদেরও কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। দাদনচক কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ইদ্রিস আহমেদ মালদা কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেন। এই কলেজের মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সুজাপুরের হুমেরা খাতুন। তিনি মালদা কলেজের পড়াশোনা শেষ করে রাজশাহী কলেজে ভর্তি হন পরে তিনি রংপুরের বিখ্যাত ডাক্তার হিসেবে পরিচিত হন।[২৯]

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষা ও শিক্ষিতের হার স্থান, কাল, সম্প্রদায় ভেদে বিভিন্ন হতে পারে। শিক্ষার হার সাধারণত নির্ভর করে কোন সম্প্রদায়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের ওপর ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশে দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্প্রদায় হল মুসলিম জাতি। পশ্চিমবঙ্গেও দ্বিতীয় বৃহত্তম ও প্রথম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মুসলিম। কিন্তু বর্তমানে মালদা জেলায় মুসলিম জনসংখ্যার ভিন্ন চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। ২০১১ এর সেন্সাস অনুযায়ী মালদা জেলার বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যা হল ৫১.২৭ শতাংশ। এই মুসলিম জনজাতির অর্ধেক হচ্ছে নারী। স্বাভাবিকভাবেই নারীশিক্ষা, নারী উন্নতি ব্যতীত সমগ্র জনজাতির উন্নতি অসম্ভব। উপরিক্ত আলোচনায় দেখতে পাওয়া যায় স্বাধীনতার পূর্বে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের মালদা জেলায় মুসলিম জাতির শিক্ষার উন্নতি বিশেষ ঘটেনি। মধ্যযুগীয় মুসলিম সমাজ তখনও নারী শিক্ষার বিরোধী ছিল। ১৯ শতকের শেষ দিকে কিছু সমাজ সংস্কারক মুসলিম ব্যক্তিবর্গ নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শুরু করে। ফলে নারী শিক্ষার খানিকটা অগ্রগতি ঘটলেও আশানুরূপ ফল হয়নি। ১৯৫১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ভারত পশ্চিমবঙ্গ তথা মালদা জেলার শিক্ষার হার পর্যালোচনা করলে নারী শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে সম্মক ধারণা পাওয়া যাবে।

উপরিউক্ত সারণি থেকে পরিষ্কার যে ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গে নারী শিক্ষার হাড়ের তুলনায় মালদা জেলার নারী শিক্ষার হার অনেক কম। তবে ১৯৯১ থেকে ২০১১ এর সেন্সাস রিপোর্টের দিকে তাকালে পরিষ্কার বোঝা যায় যে এই সময়কালে নারী শিক্ষার অগ্রগতি খানিকটা ত্বরান্বিত হয়েছে। ১৯৯১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত মালদা জেলার নারী শিক্ষার হার যথাক্রমে ২৪.৯২ শতাংশ ৪১.২৫ শতাংশ এবং ৫৬.৯৬ শতাংশ। উপরোক্ত সারণী থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ বিভাজন ও নজরে আসে। উপরিউক্ত সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে পুরুষ শিক্ষার হার যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে নারী শিক্ষার হার ততটা বৃদ্ধি পায়নি।

১৯৫১ থেকে ৮১ পর্যন্ত সময়কালে নারী শিক্ষার অগ্রগতি খুব ধীর গঠিত হয়েছে। ১৯৯১-২০১১ পর্যন্ত সারণীটি দেখলে বোঝা যায় যে মালদা জেলায় নারী শিকার হাড় ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে নারী শিক্ষার অগ্রগতি ঘটলেও মুসলিম নারী শিক্ষার অগ্রগতি বিশেষভাবে হয়নি। ২০০১ এর সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় যে মালদা জেলার মুসলিম স্ত্রীর শিক্ষার হার ছিল ৩৮. ৬৮ শতাংশ এবং পুরুষ শিক্ষার হার ছিল ৫১.৫৬ শতাংশ। আবার ২০১১ রিপোর্টে মালদা জেলার মুসলিম নারী শিক্ষার হার ৫৭.২০ শতাংশ এবং পুরুষ শিক্ষার হার ৬৬.৮০ শতাংশ। ২০০১ এর সালে স্ত্রী পুরুষের শিক্ষার হারের ব্যবধান প্রায় ১৩% এবং ২০১১ সালে শিক্ষার হারের ব্যবধান ১০% তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলির মধ্যে অন্যতম মালদা জেলার প্রায় অর্ধেকেরও বেশি হচ্ছে মুসলিম জনজাতি এবং এই মুসলিম জনজাতির প্রায় অর্ধেক নারী তাই নারীর শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনা ব্যতীত আলোচ্য প্রবন্ধটি সম্পন্ন করা অসম্ভব। মালদা জেলার মুসলিম নারীর শিক্ষাগত অবস্থান পর্যালোচনা করার জন্য ২৯ শে নভেম্বর ২০২১ থেকে ২৯শে মে ২০২২ পর্যন্ত সময়কালে ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছি। ক্ষেত্র সমীক্ষা করার জন্য প্রশ্নসূচি নির্মাণ করি। ক্ষেত্র সমীক্ষা করার জন্য মালদা জেলার গ্রামাঞ্চলের তিনটি ব্লক ও শহরাঞ্চলের একটি ব্লক (পৌরসভা এলাকা) নির্বাচন করি। গ্রামাঞ্চলের সব থেকে বেশি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার হিসেবে দক্ষিণ মালদার কালিয়াচক ১ (গ্রামাঞ্চল) ও ইংরেজবাজার (পৌর এলাকা) সমীক্ষা ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছি এবং উত্তর মালদার মানিকচক ব্লক (মাঝারি মাপের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা) এবং রতুয়া ১ ব্লক কে সমীক্ষা ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছি।

২০১১ এর সেন্সাস অনুযায়ী কালিয়াচক ১ ব্লকের মোট জনসংখ্যা হল ৩৯২৫১৭, তার মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা হল ৩৫০৪৭৪ (৮৯.২৯%)। দেখা যাচ্ছে কালিয়াচক ১ ব্লক হল সবথেকে বেশি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৯.২৯% লোক মুসলিম, তার মধ্যে মুসলিম পুরুষ ও নারীর সংখ্যা হল যথাক্রমে ১৭৮৭৯৫ (৫১.০১%) ও ১৭১৬৮০ (৪৮.৯৯%)। গ্রামাঞ্চলের আরেকটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা হলো রতুয়া ১ ব্লক, এর মোট লোক সংখ্যা হল ২৭৫৩৮৮, এর মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা হল ১৮৪১৭৭ (৬৬. ৮৮%)। মোট মুসলিম জনসংখ্যার পুরুষ সদস্য হল ৯৪৬৯৫ (৫১.৪২%) এবং নারী সদস্য হল ৮৯৪৮২ (৪৮.৫৮%)। মাঝারি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা মানিকচক ব্লকের মোট জনসংখ্যা ২৬৯৮১৩, তার মধ্যে মুসলিম জনগণ হল ১১৮৩৯১ (৪৩.৮৮%)। মোট মুসলিম জনগণের ৬০৮২৯ (৫১.৩৮%) পুরুষ ৫৭৫৬২ (৪৮.৬৯%) হল নারী। আবার শহর অঞ্চল ইংরেজবাজারের মোট জনসংখ্যা ২৭৪৬২৭ এর ১৪১৪১০ (৫১.৪৯%) জনগন হল মুসলিম, মোট মুসলিম জনসংখ্যার ৭২২৯৭ (৫১.১৩%) পুরুষ ও ৬৯১১৮ (৪৮.৮৭%) নারী। এই মুসলিম জনগণের অর্ধেক হচ্ছে নারী স্বাভাবিকভাবেই এই নারী জাতির শিক্ষাগত অবস্থান জানা বিশেষ প্রয়োজন। ক্ষেত্র সমীক্ষা করার জন্য প্রত্যেকটি ব্লক থেকে ৫০০ টি করে মোট ২০০০ মুসলিম মহিলার নমুনা সংগ্রহ করি।

২০১১ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী জেলার মোট শিক্ষার হার ৬১.৭৩%, তার মধ্যে পুরুষ শিক্ষার হার ৬৬.২৪% ও নারী শিক্ষার হার ৫৬.৯৬ %। কালিয়াচক ১ ব্লকের মোট শিক্ষিতের হার ৬৫.২৫% এবং নারী শিক্ষার হার ৬২.২৫ % ও পুরুষ শিক্ষার হার ৬৮.১৩%। রতুয়া ১ ব্লকের মোট শিক্ষিতের হার ৬০.১৩%, এর মধ্যে পুরুষ শিক্ষিতের হার ৬৪.১৭%, নারী শিক্ষার হার ৫৫.৮১%। মানিকচক ব্লকের

মোট শিক্ষিতের হার ৫৭.৭৫%, মোট পুরুষ শিক্ষিতের হার ৬৪.১৮% এবং নারী শিক্ষার হার ৫০.৮৯%। একইভাবে ইংরেজবাজার পৌর এলাকায় মোট শিক্ষিতের হার ৬৩.০৩%, পুরুষ ৬৬.৯৬% এবং নারী ৫৮.৮৮% শিক্ষিত। উপরের পরিসংখ্যান থেকে এটি পরিষ্কার যে, নারী শিক্ষার হার পুরুষের থেকে অনেক কম। নাজমুল হোসেন তার "Muslim Non Muslim Differentials in Education, Empolyment and Fertility in Malda District" নামক গবেষণা পত্র থেকে কালিয়াচক ১ ব্লকের মুসলিম শিক্ষার হার পায় ৬৭.৩৬%। এর মধ্যে পুরুষ ৭০.৭৯ শতাংশ ও নারী ৬৩.৫৪ শতাংশ শিক্ষিত। আবার রতুয়া ১ এর মোট মুসলিম শিক্ষার হার ৫৭.১৪ শতাংশ, এর মধ্যে পুরুষ ৬১.৯৪ শতাংশ ও নারী ৫২.১২ শতাংশ শিক্ষিত। মানিকচক ব্লকের ৬১.২২ শতাংশ শিক্ষিতের মধ্যে ৬৫.৭০ শতাংশ পুরুষ ও৫৬.২৭ শতাংশ নারী শিক্ষিত। পৌর এলাকায় ইংরেজবাজার এর মোট মুসলিম শিক্ষিতের হার ৬১.৬০ শতাংশ, এর মধ্যে ৬৫.৩৬ শতাংশ পুরুষ ও ৫৭.৬৫ শতাংশ নারী শিক্ষিত।[৩০] নাজমুল হোসেনের পরিসাংখ্যায়ন থেকে নারী পুরুষের শিক্ষার হারের ব্যবধান দেখতে পায় এবং নারী সবসময়ই শিক্ষা ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে পিছিয়ে, এর কারণ অনুসন্ধান করার জন্য ক্ষেত্র সমীক্ষা শুরু করি।

মালদা জেলার সমীক্ষা ক্ষেত্রগুলির মুসলিম নারীর শিক্ষাগত অবস্থান

শিক্ষাগত অবস্থান	কালিয়াচক১	রতুয়া১	মানিকচক	ইংরেজবাজার (পৌরএলাকা)
অশিক্ষিত	০৯ (১.৮০%)	১২ (২.৪০%)	১৭ (৩.৪০%)	০৭ (১.৪০%)
প্রাথমিকের নিচে	৭৭ (১৫.৪০%)	৭১ (১৪.২০%)	৮০ (১৬.০০%)	৩০ (৬.০০%)
প্রাথমিক	১৩৯ (২৭.৮০%)	১১৭ (২৩.৪০%)	১৩৯ (২৭.৮০%)	১৫০ (৩০.০০%)
উচ্চপ্রাথমিক	৭৯ (১৫.৮০%)	১০১ (২০.২০%)	১১৩ (২২.৬০%)	১০৩ (২০.৬০%)
মাধ্যমিক	১১৪ (২২.৮০%)	১২৭ (২৫.৪০ %)	৯৭ (১৯.৪০%)	১১৯ (২৩.৮০%)
উচ্চমাধ্যমিক	৩৪ (৬.৮০%)	২৭ (৫.৪০%)	১৭ (৩.৪০%)	৫৬ (১১.২০%)
গ্রাজুয়েশন	১৬ (৩.২০%)	০৭ (১.৪০%)	০৯ (১.৮০%)	১০ (২.০০%)
পোস্টগ্রাজুয়েশন	০৯ (১.৮০%)	০৬ (১.২০%)	০৬ (১.২০%)	০৮ (১.৬০%)
প্রযুক্তিবিদ্যা	০৪ (০.৮০%)	০১ (০.২০%)	০১ (০.২০%)	০৭ (১.৪০%)
শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা	২০ (৪.০০%)	২১ (৪.২০%)	২১ (৪.২০%)	১০(২.০০%)
মোট	৫০০ (১০০%)	৫০০ (১০০%)	৫০০ (১০০%)	৫০০(১০০%)

তথ্যসূত্র: ক্ষেত্রসামীক্ষা (ডিসেম্বর ২০২১- মে ২০২২)

কালিয়াচক ১, রতুয়া ১, মানিকচক ও ইংরেজবাজারে (পৌর এলাকা) ৫০০টি করে মোট ২০০০ নমুনা সংগ্রহ করি। শুধুমাত্র মুসলিম মেয়েদেরই নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে আমি প্রত্যেকটি ব্লকের নমুনা গুলিকে প্রাথমিকের নিচে, প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্রাজুয়েশন, পোস্ট গ্রেজুয়েশন, প্রযুক্তিবিদ্যা ও শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষার প্রভৃতির ভিত্তিতে

ভাগ করে আলোচনা করেছি। ক্ষেত্র সমীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে কালিয়াচক ১ ব্লকের নমুনাগুলির মধ্যে ১৫.৪০% প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেনি, প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে ২৭.৮০%, উচ্চ প্রাথমিক ১৫.৮০% এবং মাধ্যমিক ২২.৮০ শতাংশ, উচ্চ মাধ্যমিক ৬.৮০ শতাংশ, গ্রাজুয়েশন ও পোস্ট গ্রেজুয়েশনে এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৩.২ শতাংশ ও ১.৮ শতাংশ, প্রযুক্তি বিদ্যাগত দিক থেকেও মুসলিম মহিলাদের অংশগ্রহণ কম দেখা যায়, মাত্র ০.৪০%। কালিয়াচক ১ ব্লকে ধর্মীয় শিক্ষা জানে ৪.০ শতাংশ মুসলিম নারী। রতুয়া ১ ব্লকের ক্ষেত্রে যে চিত্র দেখতে পায়, তা হল প্রাথমিকের নিচে প্রায় ১৪.২০ শতাংশ, প্রাথমিক ২৩.৪০ শতাংশ, উচ্চ প্রাথমিক ২০.২০ শতাংশ, মাধ্যমিক ২৫.৪০ শতাংশ, উচ্চ মাধ্যমিক ৫.৪০ শতাংশ, গ্রাজুয়েশন ১.৪০ শতাংশ, পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ১.২০ শতাংশ এবং প্রযুক্তিবিদ্যা ও শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা জানে যথাক্রমে ০.২০ শতাংশ ও ৪.২০ শতাংশ। মানিকচক ব্লকের প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত মুসলিম ছাত্রের সংখ্যা বেশি দেখা যায়। সারণিতে দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার নিচে ১৬.০০ শতাংশ, প্রাথমিক ২৭.৮০ শতাংশ, উচ্চ প্রাথমিক ২২.৬০%, মাধ্যমিক ১৯.৪০ শতাংশ এবং উচ্চমাধ্যমিকে ৩.৪০ শতাংশ মুসলিম মহিলা দেখা যায়। গ্রাজুয়েশন ও পোস্ট গ্রেজুয়েশনে ছাত্রীর সংখ্যা কমতে থাকে যথাক্রমে ১. ৪০ শতাংশ ও ১.২০ শতাংশ। প্রযুক্তিবিদ্যায় ০.২০ শতাংশ এবং ধর্মীয় শিক্ষায় ৪.২০ শতাংশ ছাত্রী দেখা যায়। ইংরেজবাজার পৌর এলাকাতেও মোটামুটি একই চিত্র দেখা যায়। প্রাথমিকের নিচে ৬.০০ শতাংশ, প্রাথমিকে ৩০.০০ শতাংশ, উচ্চ প্রাথমিকে ২০.৬০ শতাংশ, মাধ্যমিক ২৩.৮০ শতাংশ, উচ্চ মাধ্যমিকের ১১.২০ শতাংশ, গ্র্যাজুয়েশন ২.০০ শতাংশ, পোস্ট গ্রেজুয়েশন ১.৬০ শতাংশ, প্রযুক্তিবিদ্যায় ৩. ৪০ শতাংশ ও শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা জানে ২.০০ শতাংশ মুসলিম মহিলা। ৪ টি ব্লকে অশিক্ষিতের হার যথাক্রমে ১.৮০ শতাংশ, ২.৪০ শতাংশ, ৩.৪০ শতাংশ ও ১.৪০ শতাংশ ।

উক্ত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বলা যায় চারটি ব্লকেই প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার হার বেশি। কলেজ স্তর ও পোস্ট গ্রাজুয়েশন স্তরে খুব কম সংখ্যক মুসলিম মেয়েরা পড়াশোনা করতে পারে। ইংরেজবাজার পৌর এলাকায় মুসলিম মহিলাদের কলেজ স্তরে পড়ার প্রবণতা বেশি, কিন্তু গ্রাম্য এলাকায় উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের খুব কম দেখা যায়। সমীক্ষায় উঠে এসেছে বাল্যবিবাহ হল এর প্রধান কারণ। এছাড়াও সমীক্ষা চলাকালীন মুসলিম মহিলাদের কাছ থেকে জানা গেছে পারিবারিক অর্থনৈতিক দুর্বলতা ও নিকটবর্তী স্কুল-কলেজের অভাব থাকায় উচ্চশিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। অর্থনৈতিক দিক থেকেও তারা পিছিয়ে রয়েছে। মানিকচক ও কালিয়াচক ১ ব্লকের মুসলিম পরিবার গুলি পুরুষ সদস্যরা বেশিরভাগ পরিযায়ী শ্রমিক। কালিয়াচক ১ ব্লকের নারীরা বেশিরভাগ বিড়ি শ্রমিক হিসেবে কাজ করে এবং কালিয়াচক ১ ব্লকে ধর্মীয় গোড়ামী বেশি নজরে আসে। মেয়েরা বেশিরভাগ মাদ্রাসাতে পড়াশোনা করে। সুজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গ্রামগুলির মেয়েরা কাছাকাছি সুভানিয়া হাই মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাইনোরিটি স্কলারশিপ, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী প্রকল্প চালু করার ফলে বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলিতে নাম নথিভুক্ত করার প্রবণতার বৃদ্ধি পেয়েছে। ইংরেজবাজারের ওয়ার্ডগুলিতে নারী শিক্ষার প্রতি অভিভাবকদের সচেতনতা দেখা যায়। এখানকার মুসলিম মেয়েরা বেশিরভাগ হাইস্কুলেই পড়াশোনা করে। তাই শহর এলাকা ও গ্রাম্য এলাকা

সর্বত্রই মুসলিম নারী শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে। তবে শহরাঞ্চলে অভিভাবকদের সচেতনতা হেতু বর্তমানে মুসলিম নারীদের মধ্যেও শিক্ষার প্রসার ঘটেছে এবং তারা সাংস্কৃতিক দিক থেকে উন্নত হয়ে উঠেছে। তবে গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের উন্নতির জন্য আরো বেশি সরকারি প্রকল্প ও কড়া সরকারি নজরদারি প্রয়োজন।

তথ্য সূত্র নির্দেশিকা

১. Shibani Roy, *Status of Muslim Women in North India: A Study in Dynamics of Changes*, New Delhi: B. R. Publishing Corporation, 1979, p. 45.

২. GOI, Justice Rajindar Sachar (Chairperson), *High Level Committee Report on Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India*, Delhi: Akalank Publications, 2010, p. 54.

৩. Mishkat, Mazhar-e Haq*, Kitab-ul-Ilm*, Vol.1, H.No.20, pp. 274- 275.

৪. তদেব, পৃ- ২৭৪।

৫. Syed Anwar Ali, *The Spirit of Islam: A History of the Evolution and Ideals of Islam*, Delhi: B. I. Publications, 1978, p. 11.

৬. Neelam Yadav*, Education for Women*, New Delhi: Reference Press, 2003, p. 72.

৭. GOI, *The Report of the Unuversity Commission*, Delhi: Manager of Publications Civillines,

1963, pp. 342- 352.

৮. GOI, *Report of the Secondary Education commission (1952-1953),* pp. 192- 207.

৯. GOI, Ministry of Education, *Report of the National committee on Women's Education*, New Delhi: The Manager of Publication, 1959, pp. 192- 226.

১০. Pallavi Swarnika, *Women Education in the Post Independence Era*, Universe International Journal of Interdisciplinary Research, ISSN(O)-2582-6417, Vol.1, issue 5, Oct 2020, pp. 74- 79.

১১. https://WWW.millioncontent.com.html, Retrived on 19.07.2022.

১২. GOI, *Report of the Committee to look into the Cause for lack of Public Support Particularly in Rural Areas, For Girls Education and to Enlist Public Cooperation*, New Delhi: Ministry of Education, Publication No. 736, 1965, pp. 39- 47.

১৩. https://WWW.education.gov.in., *NPE 1986* Retrived on 18.07.22, pp. 38-45.

১৪. http://WWW.org/en/globalissues/women Retrived on 16. 07. 2022.

১৫. GOI, *National Policy on Education 1986*, New Delhi: Ministry of Human Resource Development, Dept of Education, May 1986, p. 6.

১৬. GOI, Planing Commission, *11th Five year Plan*, New Delhi, 2007-2012, p. 961.

১৭. তুষার কান্তি ঘোষ, *মালদহের ইতিহাসের ধারাঃ প্রাক বৈদিক যুগ থেকে স্বাধীনতার কাল অবধি,* কলকাতাঃ অক্ষর প্রকাশনী, ২০২০, পৃ-২২৭- ২২৮।

১৮. A. Mitra (ed.), *District Census Hand Book, Malda*, PCLXXXII, West Bengal, 1951.

J. C. Sengupta, *West Bengal, District Gazetter, Malda*, Calcutta: Esa.B.A, 1969, P.203.

১৯. A,Mitra, তদেব, পৃ- ১৪৬- ১৪৭।

২০. J.C.Sengupta, প্রাগুক্ত, পৃ- ২২১।

২১. তদেব, পৃ- ২২১।

২২. তদেব, পৃ- ২০৭।

২৩. প্রদ্যোত ঘোষ, *বিনয়কুমার সরকার (১৮৮৭-১৯৮৯),* কলকাতা, ১৪১৩, পৃ- ৫।

২৪. *মালদা টাউন হাই স্কুল (উচ্চমাধ্যমিক) ৫০ বছরপূর্তি উৎসব স্মরনিকা।*

২৫. G. E. Lambourne, *Bengal District Gazetter*, Malda: Esa B.A, 1918, p. 26.

২৬. *স্মরণিকাঃ জালালিয়া গার্লস স্কুল প্লাটিনাম জুবলি, বিবি জয়নাব স্মৃতিচারণ,* ১৯৯৪।

২৭. *স্মরনিকা, আইহ গার্লস স্কুল সুবর্ণজয়ন্তী,* ১৯৮৩।

২৮. এম. আতাউল্লাহ, *মালদহের মুসলিম নারী সমাজঃ একটি পর্যালোচনা,* মলয় শঙ্ক ভট্টাচার্য(সম্পাঃ),*মালদহ চর্চা,* কলকাতাঃ বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা, ২০১১, পৃ- ২৩৮।

২৯. উম্র আলি, *মালদা জেলার মুসলিম নারীদের শিক্ষাব্যবস্থাঃ একটি রূপরেখা (১৮৩৪-১৯৮৭),* শচিন্দ্রানাথ বালা ও ঋতব্রত গোস্বামী (সম্পা), *মালদা জেলার ইতিহাস সমগ্র,* কলকাতাঃ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২২, পৃ- ৪৫০- ৪৫৯।

৩০. Najmul Hossain, *Muslim Non-Muslim Differentials in Education, Employment and Fertility in Malda District, West Bengal,* Germany: LAP Lambert Academic Publishing, 2011, p. 125.

গ্রন্থ সমালোচনা

সুদীপ ভট্টাচার্য

তিস্তাপারের জলপাইগুড়ি : শহরের ইতিহাস (১৮৬৯-২০০১)

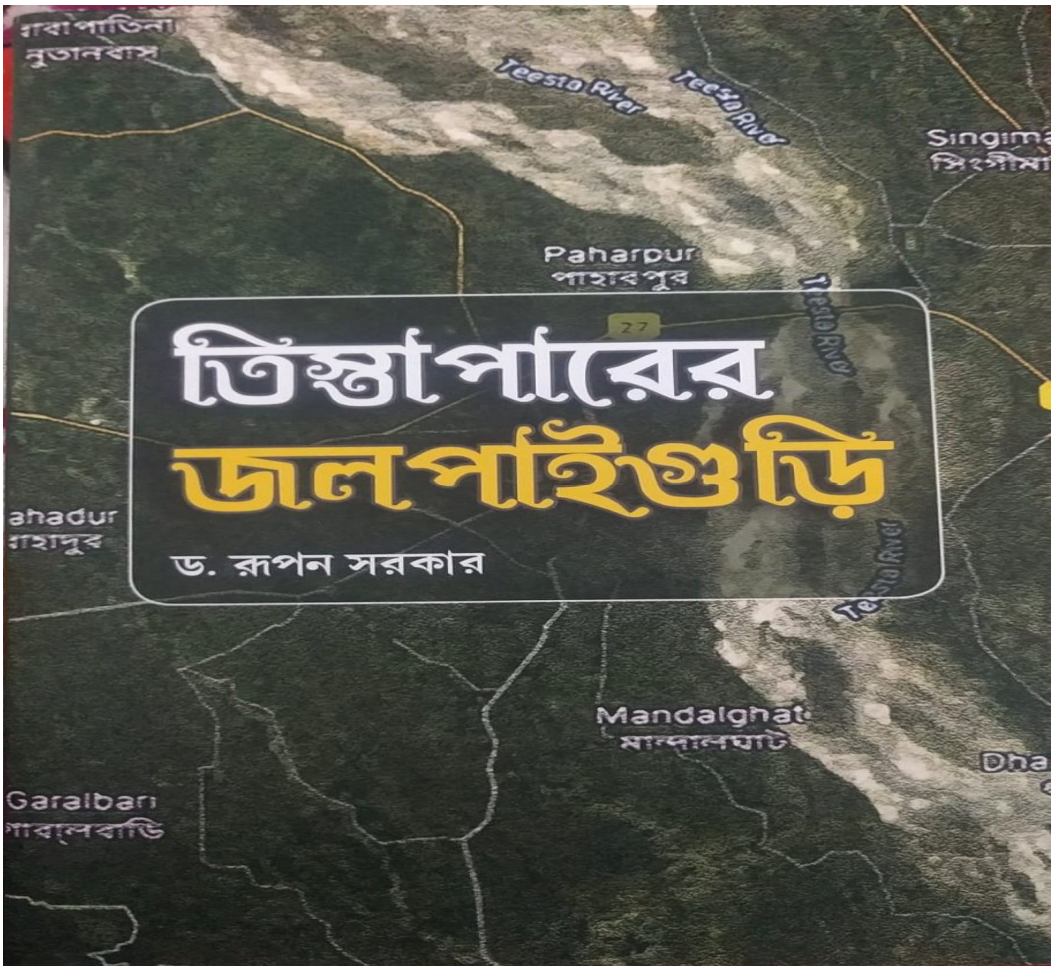

লেখক : ড. রূপন সরকার

প্রকাশক : প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ঠিকানা : বিস্তার। ৩ রাজাডাঙ্গা গোল্ড পার্ক, কলকাতা ৭০০১০৭

প্রকাশ কাল : প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর২৫, ২০২২.

গ্রন্থস্বত্ব : ড. রূপন সরকার

প্রচ্ছদ : শান্তনু সরকার

মূল্য : ৩৬০ টাকা

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২০০

হরপ্পা সভ্যতার থেকে নাগরিক জীবনের সূচনা হলেও নানা কারণে বহুকাল এই ইতিহাস চর্চা প্রলম্বিত। ভারতবর্ষ তথা উত্তরবঙ্গে নগরসভ্যতার ইতিহাস চর্চা এখনও পর্যন্ত একেবারেই গঠনমূলক পর্যায়ে বলা যায়। ১৯৬০ এর দশকে ভারতীয় শহরের ইতিহাস নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার অভাব সম্পর্কে আক্ষেপের সুর ধরা পড়েছিল বিদেশী ইতিহাসবিদের গলায়। ভারতীয় শহরের ইতিহাস চর্চার প্রথম দুটি আংশিক বিজ্ঞানসন্মত আলোচনা উঠে আসে দুজন ভূগোলবিদদের আলোচনায়। একজন বিমলেন্দু ভট্টাচার্য (১৯৭৯) এবং অন্যজন এ. আর. রামচন্দ্রন (১৯৮৯) এবং তাদের লেখা যথাক্রমে 'Urbanization in India' এবং 'Urbanization and Urban System in India' গ্রন্থ দুটিতে। সত্তরের দশকে K.N. Choudhury-র মন্তব্য এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক। তার কথায়, সমাজবিজ্ঞানের একাধিক অবহেলিত শাখার মধ্যে শহরের ইতিহাস চর্চা সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। অথচ সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শাখার মতো শহর গড়ে ওঠার ইতিহাস বা নগরায়নের ইতিহাস কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোলকাতা, বোম্বে, আমেদাবাদ, লক্ষ্ণৌর মতো শহরেই তা প্রায় সীমাবদ্ধ থেকে যায়। এপ্রসঙ্গে পথিকৃৎ ঐতিহাসিক ইন্দু বঙ্গ, অনিরুদ্ধ রায়, ভি.কে. ঠাকুর, হামিদা খাতুন নাকভি (১৯৮৬), চম্পকলক্ষ্মী (১৯৯৯) আই. এইচ সিদ্দিকি, অনিতা রায়, আর. এস. শর্মা, ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের মতো কিছু কিছু লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ইতিহাসবিদ বা গবেষক, যারা শহরের ইতিহাস চর্চার ধারাকে একটি নির্দিষ্ট রূপ দান করেন। তবে জেলা তথা প্রান্তিক ছোটো শহর বা জনপদ নিয়ে বিজ্ঞানসন্মত আলোচনা প্রায় হয় নি বললেই চলে। অথচ এক একটি শহর, এক একটি জনপদ একটি নির্দিষ্ট সময়কালের এক এক ভৌগলিক পরিসরের আর্থ-সামাজিক তথা রাজনীতি, প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান সহ মানব সভ্যতার নানান প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠানের নানা চরিত্রগত বিবর্তণের স্বাক্ষর বহন করে। প্রকৃতপক্ষেই শহরের ইতিহাস চর্চা একটি আন্তর্বিষয়ক গবেষণাক্ষেত্র, যার জন্য প্রয়োজন কল্পনাশক্তি, বিশ্লেষণী ক্ষমতা এবং অতীত সম্পর্কে যথাযথ চেতনা। এ প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গে তথা বৃহৎ বঙ্গে নাগরিক ইতিহাস রচনায় ইতিমধ্যেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন অধ্যাপক রূপন সরকার তার 'English Bazar in Colonial Bengal' গ্রন্থে, যা তাঁর গবেষণামূলক নিবন্ধ। বাংলার শহর সম্পর্কে John Broomfield তার 'Mostly about Bengal' (Essays in Modern South Asian History), New Delhi, 1982, p. 256. গ্রন্থে দেখিয়েছেন বড়ো শহরের ওপরে বেশি মনোনিবেশ করার কারণে তুলনামূলক ছোটো শহর বা জনপদ অনেক বেশি অবহেলিত। 'তিস্তাপারের জলপাইগুড়ি' সেই অবহেলার থেকে জলপাইগুড়ি শহরকে অনেকাংশেই মুক্তি দিয়েছে এবং একটি উপেক্ষিত বিষয়ের ওপরে চর্চার সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় শহর বা জনপদের ইতিহাস রচনার বিভিন্ন দিক উন্মোচন করেছে। জলপাইগুড়ি শহরের ওপরে পূর্বে বিভিন্ন বই লেখা হলেও তা ঠিক শহরের ইতিহাস চর্চা হয়েছে বলা যায়না। বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন বহু উপাদানের মাধ্যমে অধ্যাপক সরকার জলপাইগুড়ি শহরের পূর্ণাঙ্গ "নগরকেন্দ্রিক ইতিহাস" রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে নগরের ইতিহাসচর্চার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক বিষয় যেমন ৬৮-র বন্যার বিবরণের মাধ্যমে শহর বাসির আবেগ এবং অনুভূতি কেও তুলে ধরার সফল চেষ্টা করেছেন। তথ্য, তথ্যের বিশ্লেষণ, যুক্তিপূর্ণ কল্পনাশক্তি এবং অতীত সম্পর্কে যথার্থ বোধ তার লেখনীর বুনোনকে মজবুত ভিত্তি দিয়েছে।

প্রাক-কথনে নিজের গবেষণার পথ চলার প্রকাশ যে কোনো উঠতি গবেষকের কাছে অনুপ্রেরণার যোগান দেবে। জলপাইগুড়ি শহর সম্পর্কে তার ঐকান্তিক আকর্ষণ তাঁকে শহরের ইতিহাস রচনার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। অধ্যাপক সরকারের ইতিপূর্বে লিখিত ৩ টি বই যথাক্রমে : ১) 'English Bazar in Colonial Bengal' (দিল্লীর ইতিহাস বিষয়ক প্রষিদ্ধ সংস্থা মনোহর প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত)। ২) 'বাংলার নগরায়নের তিন পর্ব, প্রাচীন, মধ্য, ঔপনিবেশিক' এবং ৩) 'স্মৃতিকথায় হ্যামিল্টনগঞ্জ' নগরকেন্দ্রিক ইতিহাস রচনায় অধ্যাপক সরকারের দক্ষতার প্রমান রেখেছে। স্বাভাবিক ভাবেই চতুর্থ রচনায় (তিস্তাপারের জলপাইগুড়ি) তিনি আরো অভিজ্ঞতার এবং পারদর্শীতার ছাপ রেখেছেন।

প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে প্রাক-ঔপনিবেশিক জলপাইগুড়ির রাজনৈতিক ইতিহাস। এই অধ্যায়ে লেখক উপাদান হিসাবে সরকারি দলিল পত্র, বৈকুণ্ঠপুর রাজপরিবারের উপরে লিখিত বিভিন্ন দ্বিতীয় শ্রেণীর উপাদান, বিভিন্ন প্রথম শ্রেণীর উপাদান যেমন সরকারি রিপোর্ট ইত্যাদির উপর নির্ভর করেছেন। জলপাইগুড়ি জেলার সীমা, পরিমাপ, প্রাকৃতিক পরিবেশ, নদী, জনসংখ্যা, জন বৈচিত্র, ধর্মীয় সম্প্রীতি, জনগণের জীবিকা, সামাজিক জীবন, বিবাহ পদ্ধতি আলোচনা করে রাজ পরিবারের উৎপত্তির উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ বিশ্লেষণ করেছেন। বিশু সিংহ (১৫২৪) থেকে রানী অশ্রুমতি দেবীর (১৯৫১) আংশিক সময়কালের বিবরণ দিয়ে জলপাইগুড়ির রাজনৈতিক ইতিহাসের মনোগ্রাহী চিত্র তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে জলপাইগুড়ি নাম ব্যবহারের সময়কাল ও উৎস রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন নির্দিষ্ট কালানুক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন তথ্য প্রমানের ভিত্তিতে প্রাসঙ্গিক মতামতগুলির তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে। সর্বোপরি, তথ্যপ্রমাণ এবং নিজস্ব যুক্তি ও বৌদ্ধিকদৃষ্টিতে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মতকে বেছে নিয়েছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে জেলা গঠনের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথমেই ঔপনিবেশিক আমলে সৃষ্ট বিভিন্ন জনপদের দৃষ্টান্ত দিয়ে দ্বিমুখী প্রভাবের উল্লেখ করেছেন। একটি ধ্বংসাত্মক অপরটি গঠনমূলক। এই গঠনমূলক প্রক্রিয়ার অংশ রূপে তৎকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতি, সামরিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজন এবং ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে এই শহরের জেলা হয়ে ওঠার বর্ণনা দিয়েছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে জলপাইগুড়ির জনবিন্যাস এর পরিসংখ্যান তত্ত্বের মাধ্যমে বিবর্তন দেখিয়েছেন। প্রাথমিক পর্বের নাগরিকদের জনবসতি, ব্রিটিশ শাসক বর্গের হতাশজনক মন্তব্য, প্ররোম্ভীক তিন দশকের জনসংখ্যার পরিবর্তনহীনতা থেকে তিনটি পর্যায়ে বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে ২০০১ সাল অব্দি জনসংখ্যার বিবর্তনের উল্লেখ করেছেন। একই সঙ্গে উক্ত সমকালের জনঘনত্ব, জনবসতি, বসতিবিন্যাসের প্রকৃতিকেও বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে জলপাইগুড়ি পৌরসভা এবং পৌর পরিষেবার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন মূলত দুটি পর্যায়ে: প্রাক-স্বাধীন পর্যায় এবং স্বাধীনতা-উত্তর পর্যায়ে। জলপাইগুড়ি পৌরসভার আয়-ব্যায়, নাগরিক পরিষেবা, কর আদায়ের উৎস, পৌর প্রতিনিধি নির্বাচন ইত্যাদির তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ দিয়েছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রাক ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার, জলপাইগুড়িতে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার, পৌরপ্রশাসনের উদ্যোগ, ব্যক্তিগত উদ্যোগ, উচ্চ শিক্ষার চাহিদা, ব্রিটিশ সরকারের উদাসীনতা, সরকারি উদ্যোগে উচ্চ শিক্ষার প্রসার, বেসরকারি উদ্যোগের সরকারি স্বীকৃতি, শহরের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের কালানুক্রমিক তালিকা, স্বাধীনতা পরবর্তী উদ্যোগ, পাঠাগার-গ্রন্থগারের বিবরণ ইত্যাদি।

সপ্তম অধ্যায়ে সাংবাদিকতা, সংবাদপত্র, পত্র -পত্রিকা, নাট্য চর্চা ইত্যাদি আলোচনা করেছেন প্রাক -স্বাধীন এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে।

অষ্টম অধ্যায়ে বিষয়বস্তু বিভিন্ন ধরণের ক্লাব, খেলা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গৃহীত জনকল্যাণকর কর্মসূচী।

নবম এবং দশম অধ্যায়ে শহরের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সঙ্গে এবং শহরের আভ্যান্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং চিকিৎসাব্যবস্থার বিবরণও প্রশংশনীয়।

একাদশ অধ্যায়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে জলপাইগুড়ি শহরের অংশগ্রহণ।

দ্বাদশ অধ্যায়ে ১৯৬৮ সালের বন্যার বিবরণ। যে সমস্ত উপাদানের ব্যবহার করেছেন, বন্যার ভয়াবহতা, নাগরিক সমাজের দুর্দশা, স্থানীয় যুবকদের প্রচেষ্টা, ত্রাণকার্য, ত্রাণকার্যে পার্শ্ববর্তী শহরের ভূমিকা, প্রশাসনিক ব্যর্থতা।

অধ্যাপক সরকার ১৮৬৯-১৯০১ পর্যায়করণ এ পর্যাপ্ত পরিমান তথ্য দিয়েছেন এবং তার যথাযথ কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। যা সাধারণ পাঠকবর্গের কাছেও খুবই আকর্ষণীয় (পৃষ্ঠা:৪৭-৫১)। এই প্রসঙ্গে দুই ধরণের অভিবাসনের উল্লেখ করেছেন, যথা: 'স্বেচ্ছা অভিবাসন' এবং 'বাধ্যতামূলক অভিবাসন'। এই দুই চরিত্রের মাধ্যমে কিভাবে 'Pull Factor' এবং 'Push Factor' কাজ করেছে, সেই দিকটিও ফুটিয়ে তুলেছেন কার্যকারণ তত্ত্বের নিরিখে (পৃষ্ঠা ৫১)। সমকালীন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থার মাধ্যমে বিংশ শতকের শহরের জলছবি ফুটিয়ে তুলেছেন যা সরকারি জনগণনার রিপোর্টের শুকনো তথ্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে প্রকৃত শহরের বিবর্তিত প্রাঞ্জল রূপ প্রকাশ করেছে। যার ফলে ১৯০১ সালের পঞ্চম শ্রেণীর শহরের থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর শহরের রূপান্তর অতি সহজেই বোধগম্য হয়। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ পাড়ার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের লোকবসতির সামাজিক চরিত্র গঠনের প্রেক্ষাপটের উৎস সন্ধানে সচেষ্ট হয়েছেন (পৃষ্ঠা:৫৪-৫৫)। পাড়ার নামের উৎস সন্ধানের মাধ্যমে জীবিকা ভিত্তিক বসতিকে চিহ্নিত করেছেন যা যে কোনো জনপদের ইতিহাস রচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হতে পারে (পৃষ্ঠা:৫৯)। সমকালীন উত্তরবঙ্গের অন্যান্য পৌরসভা গঠনের সময়কালের মাধ্যমে জলপাইগুড়ি পৌরসভা গঠনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ব্রিটিশ শাসকদের অভিসন্ধি পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে (পৃষ্ঠা:৬১)। পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যার ক্রমশ বৃদ্ধি কিভাবে শহরের বৃদ্ধি এবং বিকাশের সঙ্গে সম্প্রীক্ত সেই ধারণাও পরবর্তী গবেষকদের উৎসাহিত করবে আশা করা যায় (পৃষ্ঠা:৬২)।

বিভিন্ন পরিষেবা পৌরসভা কর্তৃক কিভাবে পরিচালিত হোতো, সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ, সরকারি আইনের মাধ্যমে কিভাবে নতুন নীতি জলপাইগুড়ি শহরে কার্যকরী হয়েছিলো, নাগরিক সমাজ কিভাবে সংকটের পরিস্থিতিতে পৌরবাসীদের সাহায্য করেছিল ইত্যাদির বিস্তারিত

বিবরণের মাধ্যমে পৌরকর্মের এক প্রতিচ্ছবির মালা গেঁথেছেন খুঁটিনাটি তথ্যের আলোকবিন্দুতে (পৃষ্ঠা:৬২-৭০)। জলপাইগুড়ি শহরের শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের বিবর্তনকে লেখক নিজস্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। একই সঙ্গে সরকারি নীতির প্রয়োগ কিভাবে শহরের শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল সেই দিকটিও ব্যাক্ষা করেছেন (পৃষ্ঠা:৭৮-৭৯)। সরকারি তথ্যের উল্লেখ করে উন্নতির প্রমান দিয়েছেন। সারণীর মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা দিয়েছেন প্রতিষ্ঠার কালানুক্রম অনুযায়ী। বিশেষভাবে উল্লেখ্য বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের শুরুর প্রেক্ষাপট থেকে কিভাবে সেই প্রতিষ্ঠান উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছেছিলো সে সম্পর্কে প্রচুর তথ্যের উল্লেখ করেছেন যা তার ধৈর্য, অধ্যাবষয় এবং গবেষক দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ রেখেছে (পৃষ্ঠা:৮৪)। প্রথাগত সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি নারী শিক্ষা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থার ও পুংখ্যানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন (পৃষ্ঠা:৮৬-৯০)। সর্বোপরি শিক্ষার অপ্রথাগত প্রতিষ্ঠান যেমন গ্রন্থাগার এবং সেগুলির কর্ম পদ্ধতি সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন (পৃষ্ঠা:৯৭-৯৮)। শহরের কোন কোন মানুষ কি কি উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলো সেই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লেখক তার লেখনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। সংবাদপত্রের মাধ্যমে কিভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং সাধারণ মানুষের দাবিসমূহ সকলের কাছে পৌঁছতো সেই বিবরণও উল্লেখ করার যোগ্য (পৃষ্ঠা:১০০)। নির্ভিক সাংবাদিকতার জন্য ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচার তৎকালীন সাংবাদিকতার স্বার্থকতার প্রমাণ (পৃষ্ঠা:১০২)। এছাড়াও শহরের প্রকাশিত সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকা কিভাবে নাগরিক সমাজে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করেছিল তারও ব্যাখ্যা করেছেন (পৃষ্ঠা:১০৩)। নাট্য চর্চার মধ্যে লেখক প্রকাশ করতে চেয়েছেন কত অসুবিধা সত্ত্বেও প্রবল ঐচ্ছিক শক্তির মাধ্যমে শহরের বহু নাট্য দল সমসাময়িক কত উল্লেখযোগ্য নাটক মঞ্চস্থ করেছিল, যা সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য উপাদান হতে পারে। পাশ্চাত্য ক্লাব সংস্কৃতি কিভাবে জল শহরে প্রবেশ করলো, প্রাথমিক ভাবে ব্রিটিশ শাসকদের উদ্যোগে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং এই প্রতিষ্ঠান গুলির মাধ্যমে কিভাবে শাসক বর্গ নিজেদের উচ্চ সামাজিক মর্যাদা বজায় রাখতো সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন (পৃষ্ঠা:১০৭-১০৮)। এই সামাজিক পটভূমিতে স্থানীয় উদ্যোগে গড়ে ওঠা এবং বিভিন্ন পাড়ার নামে গড়ে ওঠা শহরের দেশীয় ক্লাবগুলিরও বিস্তারিত বিবরণ লেখক দিয়েছেন।পাঠকদের চোখের সামনে সমকালীন পরিস্থিতিকে ছবির মতো সাজিয়ে তুলেছেন তথ্যের রঙ তুলির সাহায্যে (পৃষ্ঠা:১০৮-১১২)। জনকল্যাণকর কর্মসূচীর মাধ্যমে কিভাবে জলপাইগুড়ি শহরের নাগরিকরা সহনাগরিকদের পাশে সর্বদা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সেই দিকটিরও উল্লেখ করেছেন নিজস্ব সত্ত্বায়। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ক্লাব সমূহ নয় বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিও তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। জাতীয় ধারার সঙ্গে আঞ্চলিক ধারার মাধ্যমে কিভাবে একটি ক্ষুদ্র এলাকাও স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল সেই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ধরা পরে অধ্যাপক সরকারের লেখার মধ্যে। জলপাইগুড়ি শহরের স্বাধীনতা সংগ্রামের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী কিভাবে সমকালীন জাতীয় পর্যায়ের সংবাদপত্র পরিবেশিত হয়েছিল তারও উল্লেখ করেছেন যা জলপাইগুড়ি শহরের স্বাধীনতার স্পৃহাকে বুঝতে সাহায্য করেছে (পৃষ্ঠা:১৩৫-১৩৭)।

পরিশেষে অধ্যাপক সরকারের লেখনীতে ব্রিটিশ বিরোধিতার সন্তুষ্টি লক্ষ্য করা যায় তার বক্তব্যে- "তাই মুখে ঝামা ঘষে দিতে সাহেবদের অনুসরণ করে ভারতীয়রাও গড়ে তোলে একাধিক

ক্লাব" (পৃষ্ঠা:১৭১)। জলপাইগুড়ি শহরের উপরের গবেষণার সুযোগ সম্পর্কেও তিনি পরবর্তী প্রজন্মের গবেষকদের অবগত করেছেন। কিন্তু বিংশ শতকের শেষ দিকের বিভিন্ন ঘটনাবলী শহরের সামগ্রিক অবণতির কারণ হয়ে উঠেছে যা লেখককে বিষন্ন করে তুলেছে। তবুও তিনি ইতিহাসের উত্থান-পতনের শাশ্বত তত্ত্বকে মেনে নিয়েও শেষ পংক্তিতে ইতিবাচক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। "নদীর একূল ভাঙে, ও কূল গড়ে, এই ভাঙা-গড়ার ইতিহাস, শহর জলপাইগুড়ির ইতিহাস" (পৃষ্ঠা:১৭২) শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে। এখানে দ্রষ্টব্য, আগে ভাঙা শব্দের প্রয়োগ এবং পরে গড়া অর্থাৎ অধ্যাপক সরকার আশাবাদী নবরূপে জলপাইগুড়ি শহরের ভবিষ্যত গঠন সম্পর্কে। তবে, সংখ্যা তত্ত্বের হিসাবে সরকারি রিপোর্টের ছোটো খাটো ত্রুটি সংশোধন করা যেতে পারে। জলপাইগুড়ি প্রকৃত অর্থেই এক ঔপনিবেশিক শহর হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই ঔপনিবেশিক শাসকদের উপস্থিতি ও তাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে অধ্যাপক সরকারের 'তিস্তাপরের জলপাইগুড়ি' এক অর্থে নিরব। পাশাপাশি 'চা-কর'দের (চা উৎপাদক) উল্লেখযোগ্য অবদানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শহরের ইতিহাসে চা-বাগিচা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যাক্তিবর্গের সবিস্তর অনুপস্থিতি পাঠককে নিরাশ করেছে। আশাকরি এব্যাপারে নতুন করে আলো দেখানোর চেষ্টা করবে কোন গবেষকের কলম। সার্বিক দিক থেকে অধ্যাপক সরকারের এই প্রচেষ্টা শুধুমাত্র ইতিহাসের পাঠক গবেষক ছাড়াও সাধারণ পাঠকবর্গের কাছেও সুখ পাঠ্য হবে বলে ধারণা। কারণ লেখনীর চলন গতি খুবই সাবলীল এবং স্বতঃস্ফূর্ত। স্থানীয় ইতিহাসের বিভিন্ন অঙ্গীকের সাথে সাথে নতুন রূপে জলপাইগুড়ি তথা উত্তর বঙ্গের জনপদ চর্চার ক্ষেত্রে অধ্যাপক সরকারের অবদান একটি মডেল স্বরূপ হতে পারে, যা ভবিষ্যৎ নগরের ইতিহাসচর্চার ক্ষেতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

লেখক পরিচিতিঃ সুদীপ ভট্টাচার্য, সহকারি অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, মায়নাগুড়ি কলেজ।